মতামত ও লেখা পাঠানো সহ
সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:
সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
১১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ১১-২ টা)
shramikshakti@gmail.com

শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

ভিতরের পাতায়

- বিক্রী হয়ে গেল টিবি হাসপাতাল
- সাম্প্রদায়িক খেলায় সঙ্ঘ পরিবার
- এসইজেডের শরণাপন্ন জিন্দালরাও
- টাটার সাথে সরকারের চুক্তি
- পস্কোকে রুখতে মরীয়া কৃষকরা
- একচেটিয়া পুঁজির গ্রাসে মুরগীচাষী
- টাটার সিঙ্গুর-ত্যাগ এবং অতঃপর

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | নভেম্বর ২০০৮ | বিনিময়: ২ টাকা

শেয়ার বাজারে ধস, বিশ্বজুড়ে ব্যাপক ছাঁটাই

অভূতপূর্ব সংকটে পুঁজিবাদী অর্থনীতি

গত এক-দেড় মাসের ঘটনাক্রম সারা দুনিয়াজুড়ে মানুষের কাছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়েছে। একদিকে শেয়ার বাজারে বিশাল ধস, আর রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বাজার চাঙ্গা হওয়ার অপেক্ষা, অন্যদিকে দুনিয়াজুড়ে প্রায় সমস্ত শিল্পে—উৎপাদন বা পরিষেবায় ব্যাপক কর্মচ্যুতি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেষ্টবিষ্টুদের মুখে আরো ব্যাপক কর্মচ্যুতির আশংকা—সব মিলিয়ে এরকম সংকটে বহুদিন পড়েনি 'আর কোনও বিকল্প নেই'—এর প্রবক্তারা।
কি এই সংকট? কোথা থেকে জন্ম নিল এমন সংকট? কেন মূহুর্তের মধ্যে এই সংকটের আবর্তে পড়ে গেল বিশ্বের তাবৎ দেশ? আসুন সেসব পড়া যাক, বিস্তারে, আটের পৃষ্ঠায়।

অবশেষে দুবছর বাদে

কোর্টও বললো সিপিএমই তাপসীর হত্যাকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবাই জানতো যে জমিরক্ষার লড়াই লড়তে গিয়ে খুন হন তাপসী মালিক, সিঙ্গুরের আঠারো বছরের লড়াকু মেয়েটি। ২০০৬-এর ১লা ও ২রা ডিসেম্বর সিঙ্গুরে চলে অবিরাম পুলিশী অভিযান, আর ধরপাকড়। সরকার-পুলিশ-টাটার হাতে নিজেদের বহুফসলী জমি লুঠ হয়ে যেতে দেখে জমিরক্ষার লড়াইয়ের শপথ নিয়ে সিঙ্গুরের মানুষ যখন মরণপন লড়াইয়ে, তখনই মানুষকে সমঝে দিতে সিপিএমের আঞ্চলিক নেতাদের তত্ত্বাবধানে, রাতপাহাড়ায় থাকা লোকেদের মদতে, ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে খুন করানো হয় তাপসী মালিককে। সারা বাংলা তথা ভারত সরব হয়েছে সেদিন। তবু বিচার মেলেনি। শাসক-দলের নেতাদের তরফে কুৎসিত সব ইঙ্গিত এসেছে— কখনো বলা হয়েছে এটা প্রেমঘটিত আত্মহত্যা, কখনো বলা হয়েছে তাপসীর বাবা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করেছেন এবং সেই সুবাদে তিনি প্রচারের আলোয় আসছেন।

আদালত অন্য সব প্রশ্নে সরকারী পদক্ষেপকে সীল-মোহর লাগালেও এই খুন-ধর্ষণের ঘটনাটি এতই প্রকট যে এপ্রশ্নে সত্যিটা বলতে তারাও বাধ্য হয়েছে। সিপিএমের তরফে এখনও একে সিবিআই-বিরোধী দলের যোগসাজশ বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। সিবিআইকে ডেকেছিলেন তো বুদ্ধবাবুই। কিন্তু সব প্রশ্নে সাথ দেওয়া কোর্ট যে এবেলায় তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তা তারা বোধহয় ভাবতেও পারেনি।

বোলপুর

জোট বাঁধছেন রাইস মিল শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূম ও বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে রাইস মিল এক উল্লেখযোগ্য শিল্প। বোলপুরে এধরণের মোট ১১টি রাইসমিল রয়েছে, যেখানে প্রায় ৯০০ শ্রমিক কাজ করেন। রাইস মিল শ্রমিকরা নামমাত্র ৫৫ টাকা রোজে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু ইএসআই সহ নানা সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। এই রাইস মিল শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কখনো নকশালপন্থীরা, এবং ইদানীং আরএসপি সেখানে প্রভাব বিস্তার

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

একচেটিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১০ই নভেম্বর কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। খুচরো ব্যবসায় দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, পাইকারী ব্যবসায় মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারীর মত বহুজাতিকের দখলদারির বিরুদ্ধে বিগত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সই সংগ্রহ অভিযান চলে, সেসবই এদিন জমা দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন ছোট ব্যবসায়ী সংগঠন

শেষাংশ ৩ পৃষ্ঠায়

কানোরিয়া জুট মিল

দীর্ঘদিন পর শ্রমিকরা লড়াইয়ের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিন পর কানোরিয়া শ্রমিকরা ফের নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে হেডঅফিসে বিক্ষোভ দেখালেন। গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর কানোরিয়ার রিটায়ার্ড এবং কর্মরত শ্রমিকরা হেডঅফিসে গিয়ে গ্র্যাচুইটি, পিএফ বকেটা বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে হেডঅফিসে বিক্ষোভ দেখান। বেলা ১২টা নাগাদ শ্রমিকরা হেড অফিসেক উপস্থিত হয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন। শুরুতে ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী না হওয়ার শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবশেষে শ্রমিকদের অনমনীয় মনোভাব দেখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী হয়। শ্রমিকদের পক্ষে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসেন কুশল দেবনাথ, কেশব প্রামাণিক। সুজিত ঘোড়ুই এবং সনৎ মণ্ডল। আলোচনায় ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে মিটিয়ে দেয়ার কথা জানায়। পিএফ-এর টাকা না পাওয়ার জন্য বহু শ্রমিক পেনশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এদিকে দীর্ঘ প্রায় দুবছর কারখানা বন্ধ। কারখানা খোলার আশু কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কোন ইউনিয়নই আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করছে না। লড়াইর জন্যই সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই ইউনিয়নও বর্তমানে আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করছে না। শ্রমিকরা এক অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে রিটায়ার্ড শ্রমিকরা খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এমতাবস্থায় সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নেরই একটি অংশ পুনরায় শ্রমিকদের সংগঠিত করে আন্দোলনের পথ নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা কুশল দেবনাথ বলেন— কানোরিয়ার শ্রমিকরা লড়াই করেই পশ্চিমবাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রয়োজনে শ্রমিকদের জেলে যেতে হবে। শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা করার জন্য শ্রমিকনেতাদের যে কোন আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ব্যক্তি মালিকই হোক আর সমবায়ই হোক লড়াই করেই শ্রমিকদের তা আদায় করতে হবে। সরকার বা সিপিএম পার্টির সঙ্গে আপোষ করে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা হতে পারে না বলে তিনি জানান। শ্রমিকরা ধীরে ধীরে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করছেন বলে জানা গেছে।

যারা শ্রম দিয়ে জমিতে ফসল ফলায় তারাই অবহেলিত

একসময় এরাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল 'লাঙল যার জমি তার'। শুধু শ্লোগানমাত্র নয় কৃষক আন্দোলন বহুলাংশে আবর্তিত হত এই জমির মালিকানার প্রসঙ্গটিকে ঘিরে। অর্থাৎ জমির প্রকৃত মালিক কে— জমিদার, না যে শ্রম দিয়ে ফসল ফলায় সে? এই শ্লোগানটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে উদ্ভুত। আদতে শ্লোগানটি হল 'ল্যান্ড টু দ্য টিলার্স' অর্থাৎ জমি যে চাষ করে জমি তারই প্রাপ্য।

জমি চাষ করে কে? জমি চাষ করে কৃষি শ্রমিকরা। তাদের বড় অংশটি ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, অপর অংশ বর্গাদার এবং প্রান্তিক কৃষক বা ছোট জোতের মালিক। এই কৃষি শ্রমিকদের শ্রমের উপর ভর করে কৃষিকাজ চলে, জমিতে ফসল ফলে অথচ এরাই থেকে যায় অবহেলিত। জমিদার জোতদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী থেকেছে দীর্ঘদিন। ইদানিং এধরনের আন্দোলন বড় একটা দেখা যায় না। এ রাজ্যের বামপন্থীদের অধঃপতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এখানকার ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন অবহেলিত হয়েছে— সে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনই হোক কিম্বা জমি দখলের আন্দোলনই হোক। সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিগুলিও কৃষি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফলে কৃষিক্ষেত্রে যে বিরাট পরিমাণ পরিবর্তন এসেছে সে কথা মাথায় রেখেও বলা যায় এ কাজটি অবহেলিত থেকেছে।

অমৃত পৈড়া

সাম্প্রতিক সিঙ্গুর আন্দোলনেও সে ছবি স্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের হাত ধরে দিকে দিকে বৃহৎ পুঁজিপতিরা হাজার হাজার জমি জোর করে কেড়ে নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কৃষকরা কোথাও কোথাও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। এই আন্দোলনগুলিতে ক্ষেতমজুররাও অংশগ্রহণ করছেন। এমনকি নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তারা এইসব আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকছেন। নন্দীগ্রামেও থেকেছেন, সিঙ্গুরেও আছেন।

সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানির জন্য সরকার কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়ার পর সবচেয়ে করুণ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন ক্ষেতমজুররা। যে ক্ষেতমজুররা একদিন কাজ না করলে খেতে পায় না, কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে কার্যতঃ তাদের অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে সরকার। দোবাদী ইত্যাদি ক্ষেতমজুর অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে এখন ঘরে ঘরে অনাহার আমরা। ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি সরকার ভাবেনি, কোন দায়িত্ব নেয়নি। টাটা কোম্পানির তো এ ব্যাপারে কোন দায়ই যেন নেই। তারা শুধু নিজেদের লাভের বিষয়টা নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নতুন প্যাকেজে 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের' নির্ধারিত মজুরী হিসেবে ৩০০ দিনের মজুরী ক্ষেতমজুরদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যার অর্থমূল্য কুড়ি হাজার টাকার মতো। অন্যদিকে 'পশ্চিমবঙ্গ' কৃষিজমি জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির পক্ষে ১০০০ দিনের মজুরী দাবি করা হয়েছে। ক্ষেতমজুরদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের বিষয়টি কিন্তু অবহেলিতই থেকে গেছে।

পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন ক্ষেতমজুররা জমিদার জোতদারদের দ্বারা শোষিত হতেন, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় তেমনই বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা এরা নিপীড়িত। শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর শ্রেণীগত আন্দোলন ছাড়া শিল্পশ্রমিক বা কৃষিশ্রমিক কারও দাবিই সমাজে জোরেসোরে উঠে আসবে না। দেশের বিভিন্ন জায়গায় জমি রক্ষার আন্দোলনগুলিতেও শ্রমিকশ্রেণীকে নিজস্ব শ্রেণীগত স্বাধীন অস্তিত্বের জানান দিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বিকশিত না হলে এ শোষণ বঞ্চনার অবসান হবে না।

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, নভেম্বর '০৮

পুঁজিপতিদের বর্বর হামলার পক্ষে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের ওকালতি

শিল্পায়ন-উন্নয়ন-এর নামে এদেশে পুঁজিপতিদের কী জঘন্য হামলা চলছে তা আজ আর কারও কাছেই অজানা নেই। জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে পুঁজিপতিরা, তাদের সরকার, শাসকদলগুলি কতদূর নির্মম দমন-পীড়ন চালাতে পারে তা কলিঙ্গনগর থেকে সিঙ্গুর সর্বত্রই স্পষ্ট। বলা বাহুল্য যেসব প্রকল্পকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজ আন্দোলন চলছে এসবই আসছে বিশ্বায়নের হাত ধরে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই বিশ্বায়নের বর্বরতম দিকটি কিন্তু জমি অধিগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বর্বরতম দিকটি হল শ্রমিকশোষণ। বিশ্বায়নের হাত ধরে এ দেশে যে আর্থিক সংস্কার শুরু হয় তার প্রথম পদক্ষেপ হল শ্রমিকদের মজুরী কামানো, শ্রম আইনে যে ছিটেফোঁটা অধিকার শ্রমিকদের এসেছিল সেগুলিকে কেড়ে নেওয়া, সর্বত্র কাজের বোঝা বাড়ানো, কাজের সময় বাড়ানো, ঠিকা প্রথায় কাজ করানো, অন্যান্য আর্থিক সুরক্ষার বিষয়গুলিকে কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি। বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা প্রায় হয় না বললেই চলে। ফলতঃ মালিকশ্রেণীর এই হামলাগুলিকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেওয়া হয়। 'সেজ' আইন এই হামলার একটি মডেল বলা চলে যেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকেও কেড়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেজ প্রকল্পের বাইরেও যে সমস্ত নতুন প্রকল্প গড়ে উঠছে সেখানে এবং পুরনো শিল্পগুলিতেও কম বেশি সেজ আইন মলিকরা চালু করে দিয়েছে। জুটমিলগুলোতে মজুরী যেভাবে কমানো হয়েছে, স্থায়ীকরণের বিষয়টিকে যেভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে, জিরো নাম্বার, ভাউচার ইত্যাদির নামে যা চলছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের নেতারা মালিকের দালাল কিম্বা ঠিকাদারে পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদ করলেই শ্রমিকদের গেটের বাইরে কিম্বা গুণ্ডা পুলিশ দিয়ে হামলা চালানো হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি, পিএফ-এর টাকা মালিকরা মেরে দিচ্ছে। কোথাও শ্রমিকদের বলবার কোন জায়গা নেই। শ্রমিকদেরও যে সহ্যের একটা সীমা আছে এটা মালিক ও তার ম্যানেজমেন্টের লোকেরা ভুলে যায়। এইরকম দম বন্ধ করা বর্বর হামলার মুখে ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা যে কোথাও কোথাও মালিকের লোকজনদের ধরে পিটিয়ে দেবে এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। যদিও সংগঠিত শ্রমিকদের আন্দোলনের দিক থেকে শ্রমিকদের এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সব সময় ভাল ফল দেয় না; কিন্তু আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটে। সাম্প্রতিককালে নয়ডায় একটি ইতালীয় বহুজাতিক কোম্পানীর শ্রমিকরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ম্যানেজমেন্টের লোকদের পিটিয়েছেন, পশ্চিমবাংলায়ও ল্যামটেক্স ইঞ্জিনীয়ারিং ও দু-একটি জায়গায় এধরনের ঘটনা ঘটেছে।

মালিকশ্রেণীর একনিষ্ঠ সেবক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ সেপ্টেম্বর '০৮ তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ঘটনাগুলিকে 'বর্বর আন্দোলন' বলে গালাগালি করেছে এবং আরও শ্রমিকবিরোধী শ্রম আইন তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই আনন্দবাজারীয় সংবাদমাধ্যম বা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী কিন্তু ৬০ টাকায় ১২ ঘণ্টা শ্রমিক ঘাটানোটাকে বর্বর মনে করে না, গরীব অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকের কোটি কোটি টাকা পিএফ, গ্র্যাচুইটি মেরে দেওয়াটাকে বর্বর মনে করে না, যখন খুশি শ্রমিককে লাথি মেরে গেটের বাইরে বের করে দিয়ে পরিবারসহ সেই শ্রমিককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াটাকে বর্বর মনে করে না। এদের বিচারে দিনের পর দিন হাজার হাজার শ্রমিককে হত্যা করার মধ্যে কোন বর্বরতা নেই, দুই-একটি মালিকের লোকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের হামলার মধ্যেই যাবতীয় বর্বরতা। কেন গরীব, শান্ত শ্রমিকরা এরকম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তার কোন পর্যালোচনাও এরা করে না। উল্টেপ্রস্তাব দেয় আরও কঠোর শ্রম আইনের।

স্বাভাবিক কারণেই এই বর্বর বুর্জোয়া সাংবাদিকতার বিরুদ্ধেও শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন হতে হবে। এর বিপরীতে শ্রেণী সচেতন সাংবাদিকতা, শ্রেণী সচেতন সংবাদমাধ্যম গড়ে তোলার রাজনৈতিক কর্তব্যও শ্রমিকশ্রেণীকে গ্রহণ করতে হবে।

এক টাকায় বিক্রী হয়ে গেল সরকারী টিবি হাসপাতাল

বিষান দত্ত

'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' এই শব্দগুচ্ছ আজ আমাদের বহু পরিচিত। অত্যন্ত সাধারণ এক স্বাভাবিক একটা ধারণা, বিশেষত বর্তমান প্রজন্মের কাছে। এই বেসরকারি শিক্ষার বিজয়রথে আমরা (মানে ভারতবর্ষ) আরোহন করেছি আজ থেকে প্রায় দু-দশক আগে ১৯৮৬-র রাজীবগান্ধীর নয়া শিল্পনীতির প্রণয়নের মাধ্যমে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বামপন্থী মেহনতী মানুষের সরকারও কিন্তু মুখে ডানপন্থীদের মুণ্ডপাত করতে করতেই তাদেরই তৈরি এই রথের চাকায় গতিশীলতা বৃদ্ধির কাজে নেমে পড়লেন। শুধু তাই নয় এতটাই বৃদ্ধি করলেন এর গতিবেগ, এতটাই মসৃন করলেন এর পথ যে অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে গেলেন বিভিন্ন রাজ্যের ডানপন্থী সরকারকেও (কেন বলছি তা পরের অনুচ্ছেদগুলিতে থাকছে)। এরই ফলশ্রুতিতে আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড়শ বিভিন্ন প্রফেশনাল কলেজ, যার সর্বশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট সংযোজন যাদবপুরের কেপিসি মেডিকেল কলেজ।

এই সর্বশেষ সংযোজনটির জন্য ঠিক কি কি করলেন আমাদের মাননীয় সরকার, কতটা নীচে নামলেন তা একটু দেখি। যাদবপুরের ঐতিহাসিক কে এস রায় টিবি হাসপাতালের কথা আমরা সকলেই জানি। যা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষেরই নয়, সমগ্র এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন যক্ষ্মা হাসপাতাল। এখানেই কবি সুকান্ত তার জীবনের শেষ সময়টা কাটিয়েছিলেন, আর তারই ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই কে এস রায় টিবি হাসপাতালের ২০০ বিঘা জমি ও সিংহভাগ পরিকাঠামো বিলিয়ে দিলেন কালী চৌধুরী নামে এক অনাবাসী স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীর কাছে মাত্র ১ টাকায়। তবে এটা করার আগে তারা হাসপাতালটির পরিষেবা করেছেন বেহাল, রোগী ভর্তির প্রক্রিয়া করেছেন জটিল থেকে জটিলতর। কাজেই এ হাসপাতাল রেখে তার কোন লাভ নেই, যক্ষ্মা রোগটাও এখন আর তত হয় না, হলেও তত মারাত্মক নয় এসব যুক্তি তুলে ধরেছেন মানুষকে বোকা বানাবার জন্য। দেখা যাক এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লুএইচও) কি বলছে। ২০০৮-এর এদের রিপোর্ট অনুসারে ভারত বর্তমানে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যায় বিশ্বে প্রথম। বিশ্বের মোট যক্ষ্মা রোগীর প্রতি পাঁচ জনের একজন ভারতীয় (অর্থাৎ ২০ শতাংশ যেখানে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের ১৫ শতাংশ অতএব টিবি রোগীর ঘনত্বও এখানে বেশি)। শুধু তাই নয় এনটিও জানাচ্ছে ভারতে বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এবং এইডস-এর বিস্তারের সাথে সাথে এই ধরনের যক্ষ্মার বিস্তারের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এর মোকাবিলার জন্য কেবল ডটস ক্লিনিক যথেষ্ট নয় দরকার বিশেষজ্ঞ যক্ষ্মা হাসপাতাল। এমতাবস্থায় এতবড় যক্ষ্মা হাসপাতালটি বিলিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

এরপরেও আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যক্ষ্মা হাসপাতালটি তুলে দেওয়া যেতে পারে তবে আসে দ্বিতীয় প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের পয়সায় গড়ে ওঠা পরিকাঠামোকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার যাথার্থ্য কি? পশ্চিমবাংলায় কি সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, হাসপাতাল উদ্বৃত্ত হয়ে গেছে? তবে কেন ওই পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন করে আধুনিক যক্ষ্মা হাসপাতাল বা নিদেনপক্ষে সাধারণ হাসাপাতালে পরিণত করা গেল না সাধারণের চিকিৎসার জন্য? পরিবর্তে সেখানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অনিয়ন্ত্রিতভাবে, সমস্ত নিয়মকানুনকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ ট াকার বিনিময়ে কার্যত এমবিবিএস ডিগ্রী বিক্রীর একটি সেলস কাউন্টার খোলা হল। নির্মীয়মান কলেজে এমসিআই (মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া)-এর নির্দেশিত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও কি করে তারা ছাড়পত্র পেলেন তা বোঝা গেল না। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে দুটি কমিটি (ফি নির্ধারণ কমিটি ও ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ কমিটি) গঠন না করেই রাজ্য সরকার যেকোন মূল্যে এমবিবিএস ডিগ্রী বেচতে ছাড়পত্র দিলেন। কোন বেতন কাঠামো না জানিয়েই অভিভাবকদের কাছ থেকে সই করিয়ে নেওয়া হল তারা যেকোন বেতন বহন করতে রাজি। যদিও ৬ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা ঋজু হওয়ার পরই সাততাড়াতাড়ি একটি বেতন কাঠামো পেশ করে বলেন ম্যানেজমেন্ট কোটার ৭৭টি সীটের জন্য ১৯.৫ লক্ষ ও জয়েন্টের ৫০টি সীটের জন্য ৬.৫ লক্ষ। কিন্তু এই বেতন কাঠামো কিসের ভিত্তিতে তার কোন ব্যাখ্যা নেই যদিও সুপ্রীম কোর্টের পরিষ্কার নির্দেশনামা রয়েছে অলাভজনক বেতন কাঠামো তৈরির। আর এই নির্দেশনামাগুলি তৈরি হয়েছে সমস্ত মামলার ভিত্তিতে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপক্ষ ছিল বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি। আর আমাদের রাজ্যে বামপন্থী সরকার কেপিসি-র দোসর এই জনস্বার্থ মামলায়। তবে এই বেতন কাঠামোতেও নাকি তারা খুশি নয়। শোনা যাচ্ছে রাতের আঁধারে যারা দিয়েছেন এবং বিপুল অঙ্কের অতিরিক্ত টাকা তাদেরই নাম এসেছে মেধা তালিকায়। মেধা তালিকাই বটে! জয়েন্ট এন্ট্রান্সকে বাইপাস করে এক হাস্যকর পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা শোনা গেল ফাঁকা খাতা জমা দিয়ে নাম তোলার গল্প।

আজ যারা এত লক্ষ টাকা খরচ করে ডাক্তারি ডিগ্রী কিনছেন, তারা সেই টাকা তুলছেন কাদের থেকে। আর অপ্রতুল পরিকাঠামোয় শিখবেনই বা কতটা। সাধারণ রোগগ্রস্ত মানুষের অসহায়তায়ই কি পণ্য হবে না তখন? আজও যারা প্রায় বিনা খরচে মানুষের পয়সায় ডাক্তারী পড়েন তাদের কাছে মানুষের যতটুকু দাবিও থাকে, তা কি আর থাকবে এদের কাছে? আর এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এরপর আছে কামারহাটী সাগর দত্ত হাসপাতাল তুলে দিয়ে আপোলো গ্রুপের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পাইপলাইনে আরও ৫-৬টি, সবশেষে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিকেও অধিগ্রহণের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি। পুরো প্রক্রিয়াটা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভের কোন ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

আসলে বিশ্বায়নের পথে পা বাড়িয়েছি আমরা। এসব তারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। পুঁজিবাদ এক ঘোর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। বাজার তার সঙ্কুচিত। তাই স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো মূলগত চাহিদাগুলিকে এমনকি মানুষের মুখের গ্রাসকেও পণ্যে পরিণত করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সে হিংস্র, আর তাদের সাগরেদ আমাদের সরকারগুলো তা সে ডানপন্থীই হোক আর তথাকথিত বামপন্থী। কাজেই সরকার বদল হবে দল আসবে যাবে কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না। আমাদের সচেতন হতে হবে জানতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের ওপর আগ্রাসী এই শক্তি জানার বিষয়ে অনেক এগিয়ে, তার আমাদের জানতে দিতেও চায় না, কুক্ষিগত করে রাখতে চায় জ্ঞান ও তথ্য, কাজেই জানাটা খুব জরুরী। আর আমরা যদি জেনে বুঝে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারি তবে আগামী প্রজন্মের শিক্ষা স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পূর্ণ ভুলুণ্ঠিত হবে।

চিঠিপত্র

উপরতলার ঔদ্ধত্য চুঁইয়ে নিচে পৌঁছচ্ছে

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

আপনার "শ্রমিকশক্তি" পত্রিকার আমি প্রায়-নিয়মিত পাঠক। সেই সুবাদে গত জুন সংখ্যার 'পঞ্চায়েত ভোটের ফল ও সিপিএম-এর ভবিষ্যৎ একটি প্রতিবেদন' সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ করলাম।

শুরুতেই বলেছি আমি প্রায়-নিয়মিত পাঠক— কিন্তু নিয়মিত নই। উল্লেখিত জুন সংখ্যার প্রতিবেদনটি আমার ভাল লেগেছে। সেজন্য প্রতিবেদক শ্রী মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। বিগত তিন দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্য শাসনের দায়িত্বে থাকা সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার যুগপৎ পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনের ফল 'অপ্রত্যাশিত' (সত্যিই কি অপ্রত্যাশিত!) ধাক্কার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই প্রতিবেদকের মুন্সিয়ানার পরিচায়ক হিসাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। প্রতিবেদকের বাস্তব বিশ্লেষণের দক্ষতা অনস্বীকার্য

উভয় নির্বাচনে এই হতাশজনক ফলাফলের জন্য সিপিএম নেতৃত্ব যে প্রস্তুত ছিলেন না তার কথা প্রতিবেদক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই নেতৃত্ব কখনও মিডিয়াকে আবার কখনওবা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং কিয়দাংশে বুদ্ধিজীবীদের দায়ী করে প্রকারান্তে 'আত্ম সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা' চিরাচরিত প্রথায় এড়িয়ে গেছেন— কিন্তু তিনি সুন্দরভাবে তা জনসম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। আত্মসমালোচনার লক্ষ্যে সিপিএম নেতৃত্ব গণসংযোগহীনতার জন্য 'নিচুতলার কর্মীদের ঔদ্ধত্যের' কথা হাজির করেছেন। তাহলে তো সাধারণভাবে প্রশ্ন জাগে— লেজ কুকুরকে আন্দোলিত করে, না কুকুর লেজকে! এখানেও মিত্র মহাশয় তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে ঔদ্ধত্যের শিকড়ের কাছে আমাদের পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন— 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০। আমাদের আটকাবে কে?', 'লাইফ হেল করে দেব' ইত্যাদি ইত্যাদি বক্তাদের নাম উল্লেখ করে। আমরা সাধারণ মানুষজন প্রতিবেদকের সাথে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি— এবং তা হলো উপরতলার ঔদ্ধত্য চুঁইয়ে নিচে পৌঁছচ্ছে। এছাড়াও শিল্পায়ন ও জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গত, বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের সত্যিই কতটা হাতিয়ার বা বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসনের মুখে প্রকট হয়ে উঠেছে রিলিফের (সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার) রাজনীতির সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর সাথে সহমত পোষণ করেছি।

'শ্রমিকশক্তি' সম্ভবতঃ শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে ব্যাপক অংশের জনগণকে জ্ঞাত করার প্রচেষ্টায় ব্রতী। এবং নিরলসভাবে সাধ্যমতো সে কাজ করে চলেছেন। এই পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার (অবশ্য সকলেই নয়, আমার মতো জানা-বোঝা পাঠকের) কথা লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যতে যাতে এতো বেশি ইংরাজী শব্দের ব্যবহার না ঘটে তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে আখেরে পত্রিকার উদ্দেশ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। পাঠক-পাঠিকা আরো যত্ন ও আগ্রহসহকারে পড়তে বা আলোচনা করতে সুবিধা হবে। এবং শ্রমিকশক্তির, আমার মনে হয়, শ্রম ও উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ইংরাজী শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারে প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবেই বলে আমার ধারণা। এই পত্রের অনুভূতির নির্যাস যদি আপনাদের সিক্ত করতে সফল হয় তবেই এই দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার এক্ষুণি শুরু করা দরকার বলেই আমাদের বিশ্বাস। "Assertively", 'unexplored', 'Aspiration', 'pro-people', 'Assert', 'Conspiracy theory', 'Face', 'Innovation', 'percolate', ইত্যাদি শব্দগুলির বঙ্গানুবাদ করে পরিবেশিত হলে সাধারণ মানুষজন (যাঁরা মূলতঃ এই পত্রিকার গ্রাহক/পাঠক) পঠন-পাঠনে অধিক আগ্রহী হবেন। এই পত্রের বক্তব্য গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই আপনাদের নিজস্ব। পাঠক-পাঠিকার সাধ ব্যক্ত করলাম; সাধ্য হলে ব্যবস্থা নেবেন। আপনার পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি (অবশ্যই মেদহীন) কামনা করে লেখা শেষ করলাম। শুভেচ্ছান্তে—

অনিয়মিত পাঠক
সঞ্জয় দাস, বসিরহাট

কান্ধামাল

সাম্প্রদায়িক খেলায় মেতেছে সঙ্ঘ পরিবার

বিশেষ প্রতিবেদন : দক্ষিণ উড়িষ্যার আদিবাসী অধ্যুষিত কান্ধামাল জেলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবার (আর.এস.এস.) প্রভাবিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভি.এইচ.পি.)-এর সঙ্ঘাতকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রাস করেছে সমগ্র কান্ধামাল জেলাসহ সুন্দরগড়, বোলাঙ্গির, গজপতি, রায়গড়, কোরাপুট জেলার বিস্তৃত এলাকা। ঘটনার সূত্রপাত গত ২৩ আগস্ট। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় জনা চল্লিশের একটি দল ভি.এইচ.পি. নেতা স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী ও তার চার শিষ্যকে আশ্রমের মধ্যে গুলি করে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাওয়ার কারণেই খ্রিস্টান মিশনারীরা স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে হত্যা করেছে বলে ভি.এইচ.পি.-র অভিযোগ। যদিও মাওবাদী নেতা আজাদ এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে বিবৃতি প্রচার করেছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ সংগঠিত করে। ভি.এইচ.পি.র সর্ব ভারতীয় নেতা প্রবীন তোগারিয়া স্বামী লক্ষ্মণানন্দের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করার পরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, লুঠতরাজ চালানো, গির্জাগুলি ভাঙচুর করা এবং নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা সংগঠিত করা হয়। প্রাণ ভয়ে হাজার হাজার মানুষ গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে আশে পাশের জেলাগুলিতেও। পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতেই সংখ্যালঘুদের হত্যা, শষ্য ও গবাদি পশু লুঠ চলতে থাকে। বিজেপি সমর্থিত উড়িষ্যার নবীন পট্টনায়েক সরকার-এর হিন্দুত্ববাদী আচরণ সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। ব্যাপক চাপের মুখে রাজ্য সরকার প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়ে দায় এড়াতে চায়। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন, কার্ফু জারী করা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এই জঘন্য দাঙ্গার তাণ্ডব। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা ২৭। যদিও বে-সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব ইতিমধ্যে উড়িষ্যা রাজ্যের সামাজিক বাতাবরণকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আর সঙ্ঘ পরিবার তথা বিজেপি কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ ও তাদের উপাসনা স্থলগুলিতে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে এই দাঙ্গাকে সর্বভারতীয় চেহারা দিতে চাইছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোট বাড়িয়ে নেবার তাগিদে। সীমাহীন দারিদ্র, অপুষ্টি, অশিক্ষাতে ডুবে থাকা কান্ধামালের তথা গোটা উড়িষ্যার আদিবাসী মানুষদের জীবনে অগ্রগতি নিয়ে আসার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আজ দাঙ্গার বিষাক্ত সংস্কৃতি আরও বেশি করে নিয়ে আসতে চাইছে সংকীর্ণ ভোটের খেলায় জয়যুক্ত হবার জন্য। কলিঙ্গনগর, জগৎসিংপুর প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য আদিবাসী ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের বহুজাতিক কম্পানি ও বৃহৎ পুঁজিপতি বিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী সংগ্রামগুলিকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ঢেকে দিতেই কি এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা? সংগ্রামী মানুষদের আরও সতর্ক হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে মানুষের প্রতিরোধ।

একচেটিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অংশগ্রহণ করে, তেমনই মঞ্চে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচিকে অনুপ্রেরণা যোগান মহাশ্বেতা দেবী, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, কবীর সুমন প্রমুখ। বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের দিক থেকে এই সমস্যার গভীরতাকে সভায় বক্তব্যের মাধ্যমে হাজির করেন।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ— বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, ছাত্র-যুব, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। সবারই বক্তব্য, এই সমস্যা শুধু ছোট ব্যবসায়ীদের নয়, বাজার ব্যবস্থার একচেটিয়াকরণ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সমাজের নানা স্তরের মানুষকে। কাজ হারাবেন অসংখ্য মানুষ।

হিন্দুস্তান মোটরসে

সিআইটিইউ নেতাদের নেতৃত্বে

ভিআরএস-এর ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালিকী স্বৈরাচার অব্যাহত উত্তরপাড়ার হিন্দুস্তান মোটরসে। গত বছর ধর্মঘট করার ‘অপরাধে’ সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ৪০ জনকে বরখাস্ত করার পর একদিকে ট্রান্সফার আর অন্যদিকে ভিআরএসের আক্রমণ শানিয়ে চলেছে বিড়লা কর্তৃপক্ষ। সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বের অনেকেই ভিআরএস না নিয়ে টার্মিনেশনের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলে বেপরোয়া মালিক ৫৩ বছরের ওপর সমস্ত শ্রমিককে ভিআরএস নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠায়। সিআইটিইউ নেতৃত্ব তার বিরুদ্ধে লোকদেখানো প্রতিবাদ জানাতে গেলে নিজেরাই পড়ে যায় অস্বস্তিতে। তাদের রাজ্য নেতৃত্ব জানায় যে পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরও ভিআরএস নিতে হবে। এরপর সিআইটিইউ নেতাদের নেতৃত্বে ঢল নামে ভিআরএসের। সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে তাদের লড়াই জারী রাখার শপথ নিচ্ছে।

মুখটাই যখন মুখোশ

সোমনাথ নাগ

উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি সমস্ত মানুষের খাওয়া-পরা, মাথার উপর ছাদ, চিকিৎসা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। আর আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি বলতে বোঝায় বিশেষতঃ শ্রমজীবী মনুষের স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাত্রার জন্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের ক্রয়ক্ষমতা গড়ে তোলা। অর্থাৎ সাধারণ মনুষের কর্মসংস্থান লেখাপড়া, পোশাক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও মাথা গোঁজার ঠাঁই যতদিন পাওয়া না যায় ততদিন উন্নয়ন হচ্ছে তা বলা যাবে না।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার, বিশেষ করে প্রধান শাসক দল সিপিএম পার্টি উন্নয়ন নিয়ে হৈ চৈ শুরু করেছে। তারা বলছে পুঁজিপতিরা, দেশী-বিদেশী কোম্পানিরা এ রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করলেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র আমাদের কি বলছে? আসুন কিছু উদাহরণ তুলে দেখা যাক। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পুঁজিপতিরা পুঁজি বিনিয়োগ করে যে সমস্ত কারখানা স্থাপন করেছে তার ৫৬ হাজার এর বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ৫৮০ কোটি টাকা মালিকরা জমা দেয়নি। ইএসআই-এর বকেয়া ১৩০ কোটি টাকার উপর। এ রাজ্যে ইএসআই বীমাকারীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ সালের আয়ব্যায়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত থেকেছে ৪৪ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সারা ভারতে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা যেখানে ২৪৯৬৩০, এর ৪৫ শতাংশই (১১৩৮৪৫৬টি) রয়েছে এই রাজ্যে। সারা ভারতে যেখানে কলকারখানার রুগ্নতার হার ২.৫৪ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৪.১২ শতাংশ। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পগুলিকে অতিরিক্ত জমি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে। ফলে বঙ্গোদয় কটন মিল, সন্তোষ বিস্কুট কারখানা, স্মল টুলস প্রভৃতিতে পড়েছে প্রমোটারদের থাবা।

দুর্গাপুর-বড়জোড়া অঞ্চলের ২৪টি স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা চালু আছে। এই কারখানাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি পরিবেশ দূষণের দায়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে জরিমানা দিয়ে চলেছে। এই সমস্ত কারখানায় ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে, মজুরী আইন ভঙ্গ করে, শ্রমিকদের পেশাগত সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে মধ্যযুগীয় শোষণ চলছে। বিপদজনক এবং দূষণপ্রবণ শিল্প বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তা নেই। দুর্ঘটনার হিসাব নেই। মৃত্যুর হিসাব নেই। আর ক্ষতিপূরণের তো প্রশ্নই ওঠে না।

ব্যারাকপুর, আসানসোল-দুর্গাপুর, গার্ডেনরীচ-তারাতলা, হাওড়া, হুগলি শিল্পাঞ্চলের অবস্থা ভয়াবহ। বড়-মাঝারি-ছোট অসংখ্য কারখানা হয় বন্ধ অথবা রুগ্ন। কোটি কোটি টাকা বকেয়া পাওনা না পেয়ে ধুঁকছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী। হিন্দমোটর-এর মতো বড় কারখনাতে বকেয়া আদায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়ার কারণে চলছে ছাঁটাই ভি.আর.এস.। আর কলকাতার নিকটস্থ হুগলি নদীর তীরবর্তী জুট মিলগুলিতে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। কনট্র্যাক্ট, ভাগা, ভাউচার প্রভৃতি প্রথায়, অবিশ্বাস্য কম মজুরীতে খাটতে বাধ্য করা হচ্ছে হাজার হাজার জুট শ্রমিককে। এর পাশাপাশি কটন মিলগুলি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে রাজ্য জুড়ে। চা শিল্পের শ্রমিকরা রয়েছে অনাহার-অর্দ্ধাহারে।

কলকাতায় রপ্তানি নির্ভর ফ্রি ট্রেড জোন ও পরে স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) গড়া হোল। এই রপ্তানি নির্ভর সেজ অঞ্চলে আমাদের দেশের শ্রম আইন প্রযোজ্য নয়। এখানে কাজ করতে হয় ৮ ঘণ্টার অনেক বেশি সময়। তার জন্য বাড়তি মজুরি দেওয়া হয় না। এখানে কর্মরত ঠিকা শ্রমিকদের জন্য কেন শ্রম আইন প্রযোজ্য হবে না। উৎপাদন বোনাস শ্রমিকদের দেওয়া হয় না। এমনকি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার সুযোগও এখানে নেই। কলকাতার এই সেজ প্রকল্পে বিভিন্ন কোম্পানিকে জলের দরে (প্রতি ১০০ বর্গমিটার পিছু বছরে ১৬ টাকা) দীর্ঘমেয়াদী শর্তে জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সরকার যখন গরিব মানুষদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জমি দিয়েছে তখন তার মূল্য ধরা হয়েছে এর ২৫ থেকে ১০০ গুণ। প্রতি ১০০০ লিটার জল-এর কর ধার্য করা হয়েছে এই অঞ্চলে মাত্র ২ টাকা ৫০ পয়সা। আর বিদ্যুৎ করেও পাঁচ বছর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দেশি বিদেশী পুঁজিপতিদের দেওয়া হয়েছে ঢালাও ছাড়, কিন্তু শ্রমিকরা নিষ্পেষিত হচ্ছে সীমাহীন বর্বরতায়।

পশ্চিমবঙ্গে ন্যূনতম বেতন বলে কিছু চালু নেই। শিল্পভিত্তিক ন্যূনতম বেতন অত্যন্ত কম। উত্তর প্রদেশে দৈনিক ১০০ টাকা ন্যূনতম বেতন হিসাবে সর্বত্র প্রযোজ্য। অথচ এই রাজ্যে, যেখানে একটি বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় দীর্ঘদিন আসীন, ফ্লোর লেভেলে ন্যূনতম দৈনিক ৮০ টাকাও চালু করা যায়নি। কেরল রাজ্যে ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম রোজ ১২০ টাকা। তামিলনাড়ু রাজ্যে ন্যূনতম বেতন ১০০ টাকা। অথচ এই রাজ্যে শ্রমিকদের অত্যন্ত কম মজুরিতে ঘাটতে হয়। বিড়ি-শ্রমিকদের ১০০০ বিড়ি মাত্র ৩০-৩২ টাকায় বাঁধতে হয়। চা-বাগানে শ্রমিকদের রোজ সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ৭০ টাকার বেশি হবে না। যেখানে তামিলনাড়ু সরকার মহার্ঘভাতাসহ দৈনিক বেতন ১০১.২০ টাকা ঘোষণা করেছে। কর্নাটক ও কেরলে বাগিচা শ্রমিকদের দেওয়া হয় যথাক্রমে দৈনিক ৯২.৪৫ টাকা ও ৯২ টাকা। এ রাজ্যে চা-শিল্পে নারী শ্রমিকদের মজুরি পুরষ শ্রমিকদের থেকেও কম।

কর্মসংস্থানের জন্যেই শিল্পায়ন এই যুক্তি রাজ্য সরকার যখন রাখছে তখন পরিসংখ্যান বলছে যে গত পনের বছরে প্রতি ১ কোটি টাকা বিনিয়োগে গুজরাট রাজ্যে ৪.২৪ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে, এই রাজ্যে সেখানে প্রতি ১ কোটি টাকায় ২.৫২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

এই অজস্র উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের মদতে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অত্যাচার প্রতিদিন বাড়ছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেনা। তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। উপরন্তু কোটি কোটি টাকা বেমালুম আত্মসাৎ করেও বহাল তবিয়তে ঘুরছে পুঁজিপতিরা। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশী কোম্পানিদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইছেন যে সেজ অঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে একটিও শ্রমদিবস নষ্ট হয়নি। অথচ সাধারণ মানুষ বন্ধ কারখানা খোলার জন্যে বিশেষ ভূমিকা আশা করেছিল। আশা করেছিল শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা। তাই একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে সিপিএম নেতৃত্বাধীন এই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য মানুষের স্বার্থে শিল্পায়ন নয় বরং টাটা-আম্বানি-সালিমদের নির্লজ্জ দালালি করে তাদের আস্থা অর্জন করা এবং দেশি বিদেশী কোম্পানীদের এজেন্ট হয়ে রাজনীতি করে যাওয়া। তাই আজ আমাদের একদিকে এই তথাকথিত শিল্পায়নের বিরোধিতা করে বন্ধ কলকারখানা খোলার আওয়াজ তুলতে হবে। পাশাপাশি মেহনতী মানুষের বন্ধু সেজে মেহনতী মানুষের পিঠে ছুরি মারার কৌশলকে বানচাল করে দিয়ে সিপিএম পার্টির স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

শালবনী

এসইজেডের শরণাপন্ন জিন্দালরাও

শমীক চক্রবর্তী

শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত প্রকল্পকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হল। গত সেপ্টেম্বরে জিন্দালদের আবেদনের ভিত্তিতে এবং ২৪ আগস্ট রাজ্য সরকারের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পকে 'সেজ' বলে ঘোষণা করে। পাঁচ হাজার একর জমির ওপর তৈরি হবে এই প্রকল্প। ২ নভেম্বর প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হল।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে এরাজ্যের জমি অধিগ্রহণ বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন শালবনীতে জিন্দালদের প্রকল্প এক অন্য বার্তা নিয়ে আসছে বলে বহু মানুষেরই বক্তব্য ছিল। কৃষিজমির বদলে এখানে অধিগৃহীত জমির একটা বড় অংশ পতিত জমি। হিসেব অনুযায়ী, যে পাঁচ হাজার একর জমির ওপর এই প্রকল্প তৈরি হবে, তার ৫৫০০ একর জমি দিয়েছে রাজ্য সরকার, বাকি ৫০০ একর স্থানীয় মানুষের থেকে কিনেছে সজ্জন জিন্দালরা। আপাতভাবে নির্ঝঞ্ঝাট জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া। তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ, উচ্ছেদ হওয়া পরিবার পিছু একটি চাকরির গ্যারান্টি সব মিলিয়ে জিন্দালরা প্রায় একটা 'মডেল' স্থাপন করছিল। টাটারা বলছে, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও যাবো না, সালিমরা শাসকদলের ক্যাডারবাহিনীর উপর অগাধ আস্থা রেখে বলছে— রাজ্য সরকার এগোলে তারাও এগোবে আর অন্যদিকে জিন্দালরা নীরবে নিভৃতে কি করে যেন দিব্যি এগিয়ে গেছে, প্রায় কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ছাড়াই। আর সেই নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চাওয়ারই শেষ অস্ত্রটা ধরলো জিন্দালরা— 'সেজ' ঘোষণা করিয়ে নিল কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকে দিয়ে। অতঃপর শ্মশানের শান্তিতে শিল্প চলবে শালবনীতে।

কিন্তু 'সেজ' নিয়ে তো সমালোচনার ঝড় বইছে দেশজুড়ে। 'সেজ' মানে (১) দেশের মধ্যে একটা বিদেশ তৈরি। 'সেজে'র কমিশনারের আইন সেখানে শাসন করবে, দেশের সংবিধান নয়। থাকবে না শ্রম আইন, থাকবে না আন্দোলনের অধিকার। (২) 'সেজে'র জন্য কেনা বা 'সেজে' উৎপাদিত সমস্ত পণ্য করমুক্ত থাকবে। জল বা বিদ্যুৎ সহ নানা পরিষেবার হরির লুঠ মিলবে মালিকদের। (৩) পরিবেশ সংক্রান্ত আইনবিধি মানতে হবে না... এগুলো দু'একটা টুকরো ছবি, 'সেজ' মানে কি, সে বিষয়ে।

শালবনিতে উৎপাদিত সমস্ত ইস্পাতই বিদেশে রপ্তানি হবে। শালবনীর প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরিবেশও, দূষিত হবে আশপাশের বনাঞ্চল। এবং 'সেজ' হওয়ার দরুণ সেসব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। জিন্দালরা এই প্রকল্পটি প্রথমে ঝাড়খণ্ডের চান্ডিলে করবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু সেখানে আদিবাসী মানুষদের লড়াইয়ের ফলে তারা সরে আসে পশ্চিমবঙ্গের শালবনীতে। এবং এই তাড়া খেয়ে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকেই 'সেজ'-এর কথা আগে না বললেও শেষমেষ সেদিকেই হাঁটলো জিন্দালরা। সাড়ে চার হাজার একর খাসজমি সরকারের হাতে ছিল, তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হয়নি। সরকার তা তুলে দিল পুঁজিপতিদের হাতে। আদিবাসীদের জমিও নিয়ম বহির্ভূতভাবে হাতবদল করে চলে গেল তাদের হাতে। এবার আরও শোষণ যন্ত্রণার পালা— 'সেজ'-এর মালিকী রক্ষাকবচের ঘেরাটোপে।

এ পর্যন্ত লিখে লেখাটা শেষ করা যেত। কিন্তু ঘটনা মোড় নিল অন্যদিকে। শালবনিতে জিন্দালদের প্রকল্পের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও রামবিলাস পাসোয়ানের গাড়ির কনভয়ে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়, স্বভাবতই তারপর শুরু হয় পুলিশী ধরপাকড়। কিন্তু দেখা গেল, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন আদিবাসী সমাজ। তাদের বিভিন্ন সংগঠনের তরফে অবরোধ চললো জায়গায় জায়গায়, পুলিশী হয়রানির বিরুদ্ধে, নির্দোষদের মুক্তির দাবীতে। এই পর্বের শেষ কোথায় তা দেখতে হবে। কিন্তু স্পষ্টতই যা উঠে এসেছে, তা হল আদিবাসী সমাজের দীর্ঘ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ। সরকার-শাসকদল একে 'মাওবাদী' তকমা লাগাতে পারে, কিন্তু আপামর আদিবাসী সমাজের এই প্রতিবাদকে এমনকি স্থানীয় সিপিএম নেতাদের তরফে হুল বিদ্রোহ বলতেও শোনা গেছে।

নন্দীগ্রাম অবরুদ্ধ হলে, লালগড় অবরুদ্ধ হলে, কখনও বা পাহাড় অবরুদ্ধ হলে সরকার-শাসক পার্টি-মিডিয়ার ঘুম ছুটে যায়, আর যখন সেজের নামে আমাদের দেশেরই ভূখন্ড মালিকী স্বার্থে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তার বেলা?

সিঙ্গুর : কি ছিল টাটার সাথে সরকারের চুক্তিতে ?

সিঙ্গুর-এর ঘটনাপ্রবাহ আমাদের অনেকগুলি প্রশ্নর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আমাদের সামনে চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল ভারতীয় মেইন স্ট্রীম পলিটিক্স কিভাবে বড় পুঁজিপতিদের কাছে বিকিয়ে গেছে। একইসাথে আমরা দেখলাম যে শ্রমিক-কৃষক কিভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকার পুঁজিপতিদের জোটের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

এই আলোচনায় আমরা বিশ্লেষণ করব কি মূল্য আমাদের (অর্থাৎ রাজ্য-বাসীদের) দিতে হচ্ছিল টাটার 'ন্যানো' কারখানার জন্য এবং বিনিময়ে আমরা কি পাচ্ছিলাম। যাবতীয় তথ্য যা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা নেওয়া হয়েছে ডব্লুবিআইডিসি এবং টিএমএল-এর এগ্রিমেন্টের কপি থেকে যা রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে আছে।

প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া যাক যে পঃবঃ সরকার টাটা-কে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ-এর থেকে বেশী সুযোগ সুবিধা দেবে বলে দাবি করেছে। আমরা প্রথমে দেখে নেব সেই সুযোগ সুবিধাগুলো। বলে নেওয়া ভালো যে বিনিময়ে টিএম এল কি করবে তার কোনো উল্লেখ নেই। যে সুবিধাগুলো টাটা-কে দেওয়া হবে তা প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্লান্ট-এর জন্য সস্তায় জমি (ভর্তুকি দেবে পঃবঃ সরকার)

(২) কর ছাড়

(৩) শুরুতে লোন বা ধার, কারখানা শুরু করার জন্য

(৪) সস্তায় বিদ্যুৎ (ভর্তুকি দেবে সরকার)

(১) মোট প্রজেক্ট মূল্য

চুক্তিতে যা বলা আছে তা হল পঃবঃ সরকার উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ-এর সমান সুযোগ-সুবিধা দেবে। যার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে পয়েন্ট ৭-এ। চুক্তি থেকে যা পাওয়া যায় তা হল (ক) জমি, (খ) লোন এবং (গ) কর ছাড়, এই তিন মিলিয়ে ঐ সুবিধার সমান হয়। সস্তায় বিদ্যুৎ হল রাজ্য সরকারের দ্বারা অতিরিক্ত সুবিধা (বা উপহার) টাটা-কে এখানে কারখানা করার জন্য। যেহেতু সরাসরি কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই, তাই আমরা উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ যে ছাড় দিচ্ছে, সেই তথ্য ব্যবহার করব মোট প্রোজেক্ট মূল্য বের করার জন্য। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ যে প্যাকেজ দিচ্ছে তা হল—

(১) এক্সাইজ ডিউটি-র ওপর ১০০ শতাংশ ছাড় পরবর্তী ১০ বছরের জন্য।

(২) করপোরেট ইনকাম ট্যাক্সের উপর ১০০ শতাংশ ছাড় পরবর্তী ৫ বছরের জন্য এবং ৩০ শতাংশ ছাড় পরবর্তী ৫ বছরের জন্য। নিচে দেওয়া হল টিএমএল-এর আর্থিক মূল্যমান (প্রতি কোটি টাকা)

বছর	মোট রোজগার	রোজগার	এক্সাইজ	লাভ	লাভ	কর	লাভ	কর লাভ
২০০৫-০৬	২৭২৬৬.৪১	২৩৭১৮.১৭	৩৫৪৮.২৪	২৩৪৮.৯৮	১৭২৮.০৯	৬২০.৮৯	১৩.০১	২.২৮
২০০৬-০৭	৩৬৯৮৭.৮২	৩২৪২৬.৪১	৪৫৬১.৪১	৩০৮৮.১৪	২১৬৯.৯৯	৯১৮.১৫	১২.৩৬	২.৪৮
২০০৭-০৮	৪০৩৪০.৭৯	৩৫৬৫১.৪৮	৪৬৮৯.৩১	৩০৮৬.২৯	২১৬৭.৭	৯১৮.৫৯	১১.৬২	২.২৮

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে টিএমএল, মোট রোজগার-এর ১২ শতাংশ এক্সাইজ ডিউটি এবং ২.৩৫ শতাংশ কর দেয়। যদি টিএমএল ২,৫০,০০০ গাড়ি বানায় প্রতি বছর, যার দাম ১ লাখ টাকা, তাহলে মোট রোজগার ২৫০০ কোটি টাকা। তাহলে ৩০০ কোটি হ'লে এক্সাইজ ডিউটি এবং ৫৮.৭৫ কোটি হল কর।

টিএমএল মোট পাবে

(১) ৩৫৮.৭৫ কোটি টাকা প্রতি বছর (প্রথম ৫ বছর)

(২) ৩১৭.৬৩ কোটি টাকা প্রতি বছর (তার পরবর্তী ৫ বছর)

এই টাকার বর্তমান মূল্যমান ২০৬২.৭৯ কোটি টাকা।

(২) সস্তায় জমি

৬৪৭.৫ একর জমি টিএমএল কে দেওয়া হবে এবং ২৯০ একর জমি ভেণ্ডর কোম্পানিগুলোকে। লিজ-এর তথ্য ও ভাড়া চুক্তিতে বিশদ-এ আছে। যোগ বিয়োগ করে যা পাওয়া যাচ্ছে, টিএমএল রাজ্য সরকারকে জমির ভাড়া বাবদ যা দেবে তার মোট বর্তমান মূল্যমান হল ১৪.৪ কোটি টাকা এবং ভেণ্ডর কোম্পানিগুলি দেবে ২.১৩ কোটি টাকা। এতে যা দাঁড়াল তা হল রাজ্য সরকার মোট ১৫০-২০০ কোটি টাকা খরচ করেছে 'জমি অধিগ্রহণ'-এর (পুলিশ ফোর্সের খরচ বাদ দিয়ে) বদলে টাটা ও ভেণ্ডর কোম্পানিগুলি মোট ১৬.৫৩ কোটি টাকা দেবে। তাহলে রাজ্যসরকার (অর্থাৎ রাজ্যবাসী) টাটাকে আরও ১৩০-১৮০ কোটি টাকা উপহার দিল।

(৩) লোন এবং ট্যাক্স ছাড়

চুক্তিতে যা লেখা আছে তা হল রাজ্য সরকার টাটাকে ২০০ কোটি টাকা লোন দেবে ১ শতাংশ সুদে। এই ধার টাটা ৫টি সমান বাৎসরিক কিস্তিতে ফেরত দেবে, যা শুরু হবে একুশতম বছর থেকে। এর জন্য রাজ্য সরকারের মোট যা খরচা হবে তা আমরা সরাসরি হিসেব করতে না পারলেও ঘুরিয়ে পারব। আমরা আগেই দেখেছি যে জমি লোন যার ট্যাক্স-এর সুবিধা উত্তরাখণ্ড এবং হিঃ প্রঃ প্রদত্ত সুবিধার সমান হবে। জমি থেকে মোট প্রদত্ত সুবিধা হল ১৫০ কোটি টাকা। সুতরাং লোন এবং ট্যাক্স-এর ছাড় দ্বারা প্রদত্ত সুবিধা হল ২০৬৩ - ১৫০ = ১৯১৩ কোটি টাকা।

সস্তায় বিদ্যুৎ

রাজ্য সরকার টাটাকে প্রতি কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ ৩ টাকা দরে দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। এর মোট মূল্যমান হল ৭০ কোটি টাকা প্রতি বছরে। পরবর্তী ৯০ বছরের জন্য। যার মোট বর্তমান মূল্যমান ৭০৬ কোটি টাকা। এছাড়া রাজ্য সরকার টাটাকে ৬৫০ একর জমি রাজারহাট উপনগরীতে বিনামূল্যে টাটাকে দিয়েছেন প্রকল্পের জন্য যার মূল্য ১৬০ কোটি টাকা। সুতরাং আরও মোট ৮৬৫ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাটাকে উপহার দিয়েছেন রাজ্যবাসীর তরফ থেকে।

সমস্ত রকম হিসেব যোগ করে দাঁড়ায়, যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাটা-কে মোট ৩০০০ কোটি টাকা উপহার দিচ্ছেন এখানে কারখানা খোলার জন্য।

বিনিময়ে প্রাপ্ত সুবিধা

রাজসরকার বলছেন, এর বদলে সুবিধা দ্বিমুখী। এক টাটা-র কারখানায় চাকরি এবং রাজ্যের বিনিয়োগ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়া। যার ফলে তারও বিনিয়োগ আসবে। এই দুটি দাবির-ই কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই। বলা হচ্ছে মোট ১২,০০০ চাকরি হবে এই কারখানার জন্য, যার কোন প্রতিশ্রুতি টাটা-রা এখনো অবধি দেয়নি। আর অন্য বিনিয়োগ কিভাবে হবে এই বিনিয়োগ-এর হাত ধরে, তাও পরিষ্কার নয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার-এর জামশেদপুরে গত ১০০ বছর ধরে টাটাদের কারখানা আছে। এতদ সত্ত্বেও সেখানকার অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ তেমন নেই।

"গরীব" টাটা

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট দিয়েছেন তাতে দু কোটি টাকা ঘাটতি দেখিয়েছেন। অর্থাৎ গরীব পশ্চিমবঙ্গবাসী ২০০৮-০৯-এর যতো বাজেট ঘাটতি তার প্রায় ১৫০০ গুণ টাকা টাটাকে উপহার দিচ্ছেন কারখানা বানানোর জন্য, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে টাটা কোম্পানি অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধার মধ্যে আছে। যার জন্য এই উপহার। এবার দেখে নেওয়া যাক টাটা-র আর্থিক অবস্থা।

গত কয়েক বছরে টাটা গ্রুপ বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি কিনেছে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য। তার একটি হিসেব নিচে দেওয়া হল।

(১) কোরাস ২০০৭ ১২ মিলিয়ন ডলার

(২) ডেউ মোটরস ২০০৪ ১০২ মিলিয়ন ডলার

(৩) ২১ শতাংশ হিসাবে ২০০৪ ১৮ মিলিয়ন ডলার

স্প্যাবিশ বাস তৈরি সংস্থা

(৪) ইনক্যাট ২০০৪ ৫৩ মিলিয়ন ডলার

(৫) মোট ৬টি সফ্‌ট ওয়ার সংস্থা ২০০৫-২০০৮ ১০০ মিলিয়ন ডলার

(৬) টাইকো (কেবল কোম্পানি) ১৩০ মিলিয়ন ডলার

(৭) ডিসকোট ইন্ডিয়া ৬৪.২৮ মিলিয়ন ডলার

(৮) টেলেগ্লোব ২৩৯ মিলিয়ন ডলার

(৯) ইন্দো শারোক ফসলর ২০০৫

(১০) ব্রুনের মণ্ড গ্রুপ ২০০৭ ২১৫ মিলিয়ন ডলার

(১) টেটলী ২০০০ ৪০৭ মিলিয়ন ডলার

(২) ৩৩ শতাংশ (জোকেলস টী)

(৩) ৩০ (গ্রাসীয়) ৬৭৭ মিলিয়ন ডলার

(৪) গুড আর্থ কর্প— ৩২ মিলিয়ন ডলার

(৫) জেসকা

(৬) অহটেল অধিগ্রহণ— ১২১ মিলিয়ন ডলার

যোগ করলে পাওয়া যায় মোট ১৪,০৬২ মিলিয়ন ডলার যার ভারতীয় টাকার মূল্য ৫৬,২৪৮ কোটি টাকা (৪০ টাকা/ডলার হিসেবে), অর্থাৎ কিনা যে কোম্পানি তার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ৫৬,০০০ কোটি টাকা খরচা করতে পারে, তার ১৫০০ কোটি টাকা লাগে গরীব দেশবাসীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে, কারখানা খোলার জন্য। আর আমাদের মহান 'সাম্যবাদী' রাজ্যসরকার তাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'-র এর থেকে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে?

মূল রচনা: দীপঙ্কর বসু
অনুলিখনে : দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

একচেটিয়া পুঁজির করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত মুরগীচাষী

এই নিবন্ধে আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি আরামবাগ মহকুমার শতাধিক সর্বশ্রান্ত চাষীদের সঙ্গে দৈনন্দিন কথা বলে। হাজার হাজার এইসব নিঃশ রিক্ত চাষীদের অব্যক্ত বেদনার কান্না ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং খবরের কাগজওয়ালারা যেমন দেখতে পায় না, তেমনই সরকার হয়েছে কৌশলবাজী বধির। কথাগুলি আমার নয়, কথাগুলি চাষীদের।

আরামবাগ মহকুমার ৪টি থানা এলাকার সমগ্র এবং পাশাপাশি হাওড়া-হুগলি-মেদিনীপুর বর্ধমানের লাগোয়া এলাকাগুলি নিবিড় আলুচাষ এবং নিবিড় পোলট্রী মুরগী খামারের জন্য দু/এক বছর আগেও পরিচিত ছিল। এইসকল এলাকা নিম্নদামোদর এলাকার স্থায়ী বন্যাপ্লাবিত এলাকা বলে বন্যার পরেই আলু ও সব্জীচাষে চাষিরা মননিবেশ করে। রেল যোগাযোগবিহীন এইসব এলাকায় যেহেতু শিল্পসম্ভাবনা গড়ে উঠেনি এবং বন্যা প্রাদুর্ভাবে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উঠে গেছে, তখন কৃষকের ঘরের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ছেলেরা ঘরের সোনাদানা, ঘটিবাটি, জমিজায়গা বিক্রিবাটা করে অথবা ব্যাংকের নিকট বন্ধক রেখে ২০/২৫ বছর আগে থেকেই বিজ্ঞান ভিত্তিক মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে পোলট্রী খামারের ব্যবস্থা শুরু করে। একদিকে খামারের তত্ত্বাবধান অন্যদিকে পালিত মুরগীকে বাজারজাত করার জন্য কয়েক হাজার মানুষ যুক্ত থেকে জীবিকা অর্জন করতো।

এইসব ছোট ছোট খামারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকৃষি পোড়ো পুকুরপাড়, বাঁশবাগান বা গাছের নীচে ছোট ছোট ছাউনি করে পুঁজি অনুসারে ২০০/৩০০ থেকে দু-তিন হাজার পর্যন্ত মুরগী পালন করতো। যদিও এইসব খামারীদের বাচ্চা-খাবার-ঔষধের জন্য একচেটিয়াদের উপর নির্ভর করতে হতো, তবু নিজহাতের উৎপাদন বলে বিক্রি বাজারে একচেটিয়া পুঁজির উৎপাদনগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোনঠাসা করে রেখেছিল। ফলে সাধারণ মানুষ একবছর আগেও বাজারে ৩৫/৪০ টাকা কেজি দামে মুরগী কিনতে পাবতেন। এইসব ছোট উৎপাদনকারীদের শায়েস্তা করার জন্য একচেটিয়া পুঁজির উৎপাদন মালিকরা বাজারে মুরগীর দাম উৎপাদন খরচের চেয়ে কমিয়ে ৩০/৩৫ টাকা কেজি করে দেয়। ছোট উৎপাদনকারীরা সেই সঙ্কটকে কাটিয়েও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে দেখে, একচেটিয়া কারবারিরা বাচ্চা এবং খাবারের দাম দ্বিগুণের বেশি করে দেয়। ছোট খামারিরা সেই অস্ত্রকেও নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিগত তিনবছর সামাল দিয়ে

অজয় বেরা, আরামবাগ

এসেছেন।

সর্বশেষ তাদের উপর আক্রমণ নেমে এল বার্ডফ্লু নাম দিয়ে। এই আক্রমণ ছোট খামারিরা সামলাতে পারেনি। ধারদেনার দ্বালায় তারা খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এই ছোট খামারিরা যে কথাগুলি বারবার বলেছে কেউ সেকথায় কর্ণপাত করেনি। তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

এক দেড়হাজার মুরগীর খামারি সত্যেন ঘোষ সরাসরি বললেন ব্লার্ড ফ্লু-র প্রচার অতিরঞ্জিত এবং পরিকল্পিত আক্রমণ, এই পরিকল্পিত আক্রমণের মূল হোতা এই ব্যবসায় নিয়োজিত একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা। তাদের অর্থের বিনিময়ে কেন্দ্রিয় সরকার, রাজ্য সরকার, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং বড় সংবাদপত্রগুলি কেনা গোলামে পরিণত হয়েছে। আর একজন ছোট খামারী গোবিন্দ সামন্ত বলছিলেন "দেখবেন আমাদের খামারগুলি বন্ধ হয়ে গেলে এই মুরগীই আপনারা ৪০ টাকা কেজির পরিবর্তে ৭০-৮০ টাকা কেজি দামে কিনবেন।" একবছর আগেকার গোবিন্দবাবুর কথা আজ সত্যে পরিনত হয়েছে। অমল সাধুখাঁ বললেন "সবাই বড়লোকদের দালালি করছে আমাদের দেওয়ার কেউ নেই। আমাদের বৌ ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরবে আমাদের আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নাই।" তিন-চারশ থেকে দেড়-দুহাজার খামারি পর্য্যন্ত অসংখ্য মানুষের আর্তনাদে কেউ কর্ণপাত করেনি। আজ যখন ছোট খামারগুলি বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামগঞ্জে মা-বোনেদের দশ-বিশটা দেশি মুরগি চাষের গেঁড়ো তুলে দেওয়া গেছে তখন অবলীলায় ৮০-৯০ টাকা দামে মুরগী বিক্রি হচ্ছে কোন প্রতিবাদ নাই। তাদের ভবিষ্যদ্বানি একশভাগ সত্যে পরিণত হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া খামারগুলিতে বর্তমানে একচেটিয়া চুক্তির বিনিময়ে চাষ শুরু করেছে। চুক্তির শর্তানুসারে একচেটিয়ারা দেবে বাচ্চা-খাবার-ঔষধ। খামারের মালিক দেবে শেড-জল-আলো-হাওয়া-নার্সিং। বিনিময়ে দেড়মাসে দেড় কেজি ওজনে দিলে প্রতি পাখি পিছু তিনটাকা মজুরী। বাঃ সুন্দর ব্যবস্থা! নিজভূমে পরবাসী। ছিল মালিক হয়ে গেল মজুর।

আজকের এই সর্বশ্রান্ত ছোট খামারিদের প্রশ্নগুলি ছিল—

(ক) গতবছর ভারতবর্ষে কতলোক বার্ডফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছিল বা কেউ মারা গিয়েছেন কিনা? সরকার দয়া করে জানাবেন কি?

(খ) প্রচার মিডিয়াগুলি ধারাবাহিক ছয়মাস বার্ডফ্লুর প্রচার চালিয়ে কত হাজার কোটি টাকা রোজগার করেছে? এবং কে এই টাকা দিয়েছে?

(গ) মিডিয়াগুলির গরীব গ্রামবাসীর দেশী মুরগীমারার ছবি দিশি মুরগীচাষ নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নয়কি?

(ঘ) রোগী মেরে রোগ সারানোর নিদান কোন কিতাবে পাওয়া যায়?

(ঙ) রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিরাময়ের জন্য আয়ুর্বেদ ও অ্যালাপ্যাথির অজস্র ঔষধ বাজারে থাকলেও সেই নিদান ব্যবহার না করে মেরে ফেলার নিদান দেওয়া হল কেন?

(চ) মুরগী কেবলমাত্র ফ্লু রোগেই মারা যায়?

(ছ) এটা কি সত্য নয় যে, প্রতি বছরই আবহাওয়া জনিত কারণে এবং খামারের দূষণ প্রতিরোধের অভাবে গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষার শেষে রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশকিছু পাখি মারা যায়? সেজন্য তো সব পাখি কেউ মেরে ফেলে না।

(জ) যে বার্ড ফ্লুর অজুহাতে হাজার-হাজার চাষির চাষ তুলে দিয়ে সর্বশ্রান্ত করা হল তাদের কয়জনকে সরকার সাহায্য করেছে?

এটা কি সত্য নয় যে, হাজার-হাজার ছোটচাষি ধ্বংস হওয়ার পরে সারা ভারতবর্ষে এবং এই রাজ্যে ভেঙ্কিজ শুকনার মতো ২/৩টি একচেটিয়া কোম্পানি সমগ্র মুরগির বাজারটি দখল করে একলাফে মুরগীর দাম দেড়গুণ/দুগুণ বৃদ্ধি করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করছে?

উড়িষ্যায় পস্কোকে রুখতে কৃষকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

প্রদীপ রায়, ভুবনেশ্বর

নন্দীগ্রামের ধাঁচে সশস্ত্র ক্যাডার পুলিশ সহযোগে পস্কো বিরোধী গণসংগ্রামকে ভেঙ্গে দেবার কাজে আংশিক সফলতা পাওয়া গেলেও ঢিঙ্কিয়া গ্রামপঞ্চায়েত অঞ্চলে এসে তা থমকে দাঁড়ায়। হাজার হাজার গ্রামবাসীর সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে এই যৌথ বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। যদিও দখল করে নেওয়া নুয়াগাঁও, গড়কুজঙ্গ ও গোবিন্দপুর অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রস্তাবিত পস্কো প্রজেক্ট এরিয়ার ল্যান্ড সার্ভে করে নেওয়া হয়। উচ্চ হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্যাকেজ দেওয়ার কথা বলে পস্কো সমর্থকরা সাধারণ গ্রামবাসীকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। যদিও সরকারিভাবে এই প্যাকেজকে কোনদিন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। গত বছরের ২৯ নভেম্বরের পর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই অবস্থা চলার পর গত ২০ এপ্রিল পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি ব্যাপক মানুষের সমর্থনে গোবিন্দপুর গ্রামপঞ্চায়েতটি আবারও সরকারি দখলদারী মুক্ত করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে অবশিষ্ট এলাকা থেকেও পুলিশ ক্যাম্প সরকার তুলে নেয়। আর পস্কো সমর্থকদের প্রস্তাবিত প্যাকেজ সরকার অনুমোদন না করায় পস্কো সমর্থকদের প্রভাবও স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির প্রধান নেতা অভয় সাহুকে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রস্তাবিত এলাকার বাইরে গ্রেপ্তার করে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি চিকিৎসা করাতে গেছিলেন বিশাখাপট্টনমে। সেখান থেকে ফেরার পথে পারাদ্বীপ নিকটবর্তী ভুতমুণ্ডাই চক্ এলাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে পস্কো বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে পুলিশ ইতিমধ্যেই রুজু করেছে ২৫টি মামলা। গ্রেপ্তারের পর বর্তমানে তাঁকে রাখা হয়েছে কটকের চৌদুয়ার সেন্ট্রাল জেলে।

অভয় সাহুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরের দিনই (১৩ অক্টোবর) পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি (পিপিএসএস) ভুবনেশ্বরে বিক্ষোভ ও রাস্তা রোকো আন্দোলনের ডাক দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতক দলের প্রতিনিধিরা (সিপিআই, সিপিএম, এসইউসিআই, সিপিএমএল, সিপিআইএমএল লিবারেশন, এনসিপি, লোকশক্তি অভিযান, সমৃদ্ধ উরিষ্যা পার্টি প্রভৃতি) এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। পুলিশ এক'শ জনকে গ্রেপ্তার করে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য। ১৭ অক্টোবর তিনটি পঞ্চায়েতেই (নুয়াগাঁও, গোবিন্দপুর ও ঢিঙ্কিয়া) প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। ঢিঙ্কিয়ার পাটনা গ্রামে এই গ্রেপ্তারকে ধিক্কার জানিয়ে জনসমাবেশ হয় যেখানে পিপিএসএস-এর অন্যান্য নেতারা ভাষণ দেন। ২০ অক্টোবর ভুবনেশ্বরের বিধানসভা ভবনের সামনে অবিলম্বে অভয় সাহুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ধর্নার আয়োজন করা হয়। এই ধর্নায় হিরাকুঁদ জল বাঁচাও আন্দোলন, কাশিপুর কলিঙ্গনগর, লাঞ্জিগড়, বেদান্ত হঠাও আন্দোলন ও পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রামের পক্ষ থেকে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। ২৩ অক্টোবর ঢিঙ্কিয়াতে ছাত্র যুবদের মিছিল বার করা হয়। ২৪ অক্টোবর দিল্লীতে গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অবিলম্বে অভয় সাহুকে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে কনভেনশন হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ২৭ অক্টোবর কটকের পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। ১ নভেম্বর ঢিঙ্কিয়াতে আয়োজন করা হয় মহিলা সমাবেশ। এইভাবে এক ধারাবাহিক প্রতিবাদ আন্দোলন যেমন একদিকে চলছে, অন্যদিকে প্রধান নেতার অনুপস্থিতিতে পস্কো প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভেঙে দিতে সম্ভাব্য পুলিশি হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতিও নিয়ে চলেছে পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি। ইতিমধ্যে ঢিঙ্কিয়া ও গোবিন্দপুর অঞ্চলে প্রবেশ করার তিনটি রাস্তা গ্রামবাসীরা কেটে দিয়েছেন। গ্রামে প্রবেশ করার মুখে যে গেটগুলি বসানো হয়েছিল তা সিল করে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পাহারা দিতে রাত জাগছেন ৫০০ মহিলা, সহস্রাধিক গ্রামবাসী। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যাতায়াত চলছে জলপথেই। মূল আন্দোলনের পাশাপাশি পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি ইতিমধ্যে পারাদ্বীপ বন্দর ও প্রায় ৩০ হাজার জেলে সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্কটে ঠেলে দিয়ে প্রস্তাবিত পস্কোর ক্যাপটির্ভ পোর্ট গড়ার বিরুদ্ধে জটাধারী (মোহানা) বাঁচাও আন্দোলন, মহানদীর বিপুল পরিমাণ জল প্রস্তাবিত পস্কো প্ল্যান্ট-এ টেনে নেবার বিরুদ্ধে আক্রান্ত চাষীদের নিয়ে গোবরাধার (মহানদীর শাখানদী) রক্ষা করতে জল সুরক্ষা সমিতি এবং সুন্দরগড় জেলার সমৃদ্ধ আয়রন মাইনস পস্কো কোম্পানিকে দেবার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খাণ্ডাধার (আয়রণ সমৃদ্ধ পাহাড়) বাঁচাও আন্দোলনের ডাক দিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢিঙ্কিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আজ জীবন দিয়েও তাঁদের সমৃদ্ধ জমি বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। নুয়াগাঁও (যেখানে পুলিশ ক্যাম্প বা আন্দোলনকারীদের ব্যারিকেড নেই) অঞ্চলেও পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম আবারো শক্তি অর্জন করে চলেছে। সেখানকার মানুষ সরকারি জমি জরিপের সমস্ত খুঁটি ইতিমধ্যে ভেঙে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে জগৎসিংপুর জেলার মানুষ আবারো প্রতিরোধ আন্দোলনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সংবাদ মাধ্যম, সরকার ও বহুজাতিক পস্কো কোম্পানির সীমাহীন অপপ্রচারকে পরাস্ত করে সেখানকার মানুষ আবারো দুর্বার আন্দোলনের পথে সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করতে জোট বেঁধেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল মানুষকে আজ এই লড়াকু মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে। পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি সেই আবেদনই জানিয়েছে।

পস্কো

কলকাতায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত ১৪ই নভেম্বর কলকাতায় উৎকল ভবনে পস্কো বিরোধী আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে এবং ওড়িশায় পস্কোর এসইজেড প্রকল্প বাতিলের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মজদুর ক্রান্তি পরিষদ (এম কে পি) ও সিসিআরএমএল। কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে এক দৃপ্ত মিছিলে সামিল হন বহু শ্রমিক ও ছাত্র-যুব। প্রসঙ্গতঃ, গত বছর এই একই দিনে নন্দীগ্রামে এসইজেড গড়ার রক্তাক্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক ঐতিহাসিক মিছিল।

বোলপুর

জোট বাঁধছেন রাইস মিল শ্রমিকরা

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

করছিল। এসব নানা উদ্যোগের ধারাবাহিকতায়, বিশেষত ঐ অঞ্চলের পুরনো শ্রমিক সংগঠকদের উদ্যোগে আবার নতুন করে শুরু হয় সংগঠিত হওয়ার পালা, সম্প্রতি সেখানকার শ্রমিকরা দলমতনির্বিশেষে শ্রমিকদের নিজস্ব ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। বীরভূম জেলা রাইস মিল সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। ইএসআই সহ নানা দাবীকে সামনে রেখে এই পর্যায়ে শ্রমিকরা সংগঠিত হচ্ছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫০ জন শ্রমিক এই ইউনিয়নের সদস্য হয়েছেন, এবং পুজোর আগে অতিরিক্ত ৪০ টাকা বোনাস আদায়ের দাবী জিতে এনেছেন। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর এই ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

টাটার সিঙ্গুর-ত্যাগ এবং অতঃপর

মুমূর্ষু পুঁজিবাদের ভরসা ঐক্যমতের রাজনীতি

শংকর দাস

টাটা মোটরসের সিঙ্গুর ত্যাগের ঘটনায় শহুরে মধ্যবিত্তদের অনেকেই বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন। এদের অনেকেই কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরোধী। সে সংক্রান্ত দমন-পীড়নের তারা প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু ঘুনাক্ষরেও তারা ভাবতে পারেননি যে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে টাটারা সত্যিই সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যেতে পারেন। পেছনে ফেলে যেতে পারেন এমন একটা যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে যুদ্ধযুদ্ধ খেলা চলতে পারে না একেবারেই। টাটারাও থাকুক আবার উন্নয়নও হোক— এরকম দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা যেতে পারে না একেবারেই। পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীগুলির অমীমাংসেয় দ্বন্দ্ব এভাবে সামনে এসে উপস্থিত হওয়ায় দৃশ্যতই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন অনেকেই। কিন্তু ঠক কি কারণে টাটারা সিঙ্গুর ছেড়ে চলে গেল? আর এর ফলে কি ধরনের পরিস্থিতিই বা জন্ম নিল, তা আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন আছে।

টাটারা কি চেয়েছিলেন?

টাটারা চেয়েছিলেন কম পয়সায় গাড়ি বানাতে। একদিন এক ভারতীয় পরিবারের চারজন সদস্য (মা-বাবা এবং দুই ছোট সন্তান) বৃষ্টিতে ভিজে স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিল আর তা দেখে রতন টাটার আপামর জনতার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, তাই তিনি ন্যানোর মতন একটি ছোট গাড়ি যার দাম এক লাখ টাকার বেশি হবে না এরকম একটি পরিকল্পনা করেছিলেন এসব ফালতু কথা পাগলেও বিশ্বাস করে না। আজকের দিনে শিল্পপতি গোষ্ঠীগুলি বিশ্বব্যাপী যে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে সেখানে বেঁচে থাকতে গেলে উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবার দাম যে অবিরত কমিয়ে যেতে হবে এই সত্য সবার কাছেই পরিষ্কার। ধুরন্দর রতন টাটা বুঝেছিলেন যে ন্যানোর মত একটা পরিকল্পনা যদি তিনি সফলভাবে করে উঠতে পারেন তাহলে শুধুমাত্র ভারতেই নয়, গোটা বিশ্ববাজারেই গাড়ি শিল্পের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আগামী কিছুকালের জন্য তিনি রাজত্ব করতে পারবেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করা ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। যেখানে একটি তিন চাকার অটো-রিক্সার দামই বাজারে এক লক্ষ টাকার বেশ কিছুটা ওপরে সেখানে একটা চার চাকার গাড়ি তা সে যেমন হোক না কেন— তার উৎপাদন ব্যয় এক লাখ টাকার কম করে দশ শতাংশ নিচে নামিয়ে আনা ছিল আপাতদৃষ্টিতে একটি অসম্ভব পরিকল্পনা। রতন টাটাও নিজে বহুবার উল্লেখ করেছেন যে অনেকেই বলেছিল একাজ অসম্ভব। কিন্তু এই আপাত অসম্ভব কাজকে সফল করা গেল কি ভাবে? রতন টাটাসহ টাটাগোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা এর উপরে আমাদের জানিয়েছেন যে তা সফল করা গেছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নতুন কিছু প্রযুক্তির মাধ্যমে। কি সেই প্রযুক্তি বা কিভাবে সেই প্রযুক্তি এত কম পয়সায় গাড়ি উৎপাদন করতে পারে— এসব কিছুই টাটারা গোপন রেখেছেন। কিন্তু ন্যানো প্রজেক্টের খুঁটিনাটি খবর যারা রাখেন তারা টাটাদের এই দাবি শুনে না হেসে পারেননি। কারণ তারা জানেন যে কোন বিশেষ প্রযুক্তি নয়, এই অসম্ভব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার পেছনে ছিল এক বিশেষ রাজনীতি। ন্যানো প্রকল্পটির সফলতা কোন প্রযুক্তিগত প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল না, তা ছিল একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। এবং এই রাজনৈতিক প্রশ্নটির সমাধান নির্ভর করছিল প্রভাব বিস্তারকারী সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলির চূড়ান্ত ঐক্যমতের ওপর। আসলে রতন টাটারা চেয়েছিলেন সরকার, বিরোধী সব পক্ষকেই এক ঘাটে জল খাওয়াতে। জল যে তারা খাচ্ছিল না এমন নয়, কিন্তু যে চূড়ান্ত মিলজুলের মধ্য দিয়ে জল খাওয়ার দরকার ছিল— তা হচ্ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে সিঙ্গুরে ন্যানো প্রকল্পটিকে গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। টাটারা সিঙ্গুর ত্যাগে বাধ্য হন। তাহলে এবার আমাদের— দেখতে হবে যে ন্যানো প্রকল্পের পেছনের রাজনীতির স্বরূপটা কি কি ধরনের।

মিশন ইমপসিবল— একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন

এই আপাত অসম্ভব ন্যানো প্রকল্প— একটি জনপ্রিয় সিনেমার নাম অনুকরণে যাকে বলা যেতে পারে 'মিশন ইমপসিবল', তার বাস্তবায়ন নির্ভর করছিল গরীব জনগণের ভোটে একটি নির্বাচিত সরকারের 'পুঁজিবাদ বাঁচাও' রাজনীতির ওপর। সরকার রাজনৈতিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে ন্যানো প্রকল্পে শুধুমাত্র টাটারাই বিনিয়োগ করবে না, সরকারও করবে। কিন্তু সেই বিনিয়োগ থেকে সরকার কোনরকম লাভ ওঠাবে না। লাভটা পুরোপুরি জমা হবে টাটাদের তহবিলে। টাটাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে গোপনীয় চুক্তি সাক্ষরিত হয় তার যে অংশ এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তা দেখলেই এই বক্তব্যের যাথার্থতা প্রমাণিত হয়। সরকার কম পয়সায় বিদ্যুৎ দেবে। প্রায় বিনা পয়সায় জমি দেবে। ঋণাত্মক সুদের হারে ঋণ দেবে। ট্যাক্স ছাড় দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসমস্ত কিছুই সরকারের তরফ থেকে অতিরিক্ত বিনিয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই অতিরিক্ত বিনিয়োগটিই ন্যানোর মূল প্রকল্পটিকে লাভজনক করে তুলবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকারকে শুধুমাত্র লাভহীন বিনিয়োগ করলেই চলবে না, তাকে টাটা মোটরসের একজন দক্ষ সেলস্‌ম্যান-এর ভূমিকাও পালন করতে হবে। চুক্তির ৭-এর(ক) ধারার শেষ লাইনটি খেয়াল করবেন যেখানে বলা হয়েছে— "TML & GOWB will make best efforts to maximise sale of products from the "small car plant" in the state of West Bengal."

লেনিন বহুকাল আগেই সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তারপর থেকে দীর্ঘ আশি-নব্বই বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদের মস্তিষ্কে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ অনেক বেশি তীব্র হয়েছে। মুমূর্ষু রোগীটি আজকে প্রায় কোমায় আচ্ছন্ন। বেঁচে থাকার জন্য প্রতি পদে তার প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের। এই ঘটনা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, গোটা পৃথিবী জুড়েই ঘটছে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বিহীন মুক্ত বাজার অর্থনীতির মিলন ফ্রিডম্যানীয় তত্ত্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে লগ্নী পুঁজির ধ্বস সামলাতে মার্কিন প্রশাসনকে ৭০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিতে হচ্ছে, ব্রিটেনের সরকারকে দিতে হচ্ছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে বিপদগ্রস্থ এবং দেউলিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচাতে সরকারি অধিগ্রহণের হিড়িক পড়েছে। সরকার এবং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া আজকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ আর বেঁচে থাকতে পারছে না। সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো প্রকল্পটিও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

নিন্দুকেরা এমনকি এমনও বলতে শুরু করেছিলেন যে সরকার সিঙ্গুরে মোট ৯৯৭ একরের মধ্যে যে ২৯০ একর জমি অনুসারী শিল্পের জন্য বরাদ্দ করেছে, সেই জমি থেকেও টাটারা ঘুরপথে ফায়দা তোলার ধান্দায় ছিল। অর্থাৎ ন্যানো প্রকল্পটি এতই অলাভজনক একটি পরিকল্পনা যে টাটাদের শুধুমাত্র অতিরিক্ত সরকারি বিনিয়োগই যে প্রয়োজন ছিল তাই নয়, পাশাপাশি অধিগৃহীত জমিকে শুধুমাত্র কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিখণ্ড হিসাবে না দেখে তার একটি অংশকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের একটি হাতিয়ার হিসাবে দেখারও দরকার ছিল। টাটা মোটরস্, রাজ্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের আচরণই জনমানসে এই সন্দেহকে ঘনীভূত করে তোলে। টাটারা কখনই অনুসারী শিল্পের জমিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেয়নি। মূল প্রকল্প এবং অনুসারী শিল্পের জমি তারা একলপ্তে চেয়েছে। এমনকি রাস্তার একপাশে মূল প্রকল্প এবং অন্যপাশে অনুসারী প্রকল্প করার প্রস্তাবও তাদের অনুমোদন পায়নি। রাজভবন আলোচনায় এরকম একটি প্রস্তাব উঠলে মরীয়া বুদ্ধদেব বলেন যে, মূল প্রকল্প এবং অনুসারী প্রকল্প একলপ্তে প্রাপ্ত জমির ওপর গড়ে উঠবে— এটাই এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য (ইউনিকনেস্)। এটি একটি প্রযুক্তিগত প্রশ্ন এবং এ ছাড়া এই প্রকল্প হবে না। তার ভাষায়— 'আরে প্রযুক্তিটা একটু বুঝুন!' কে কি বুঝেছেন জানি না। কিন্তু রাজ্যের জনগণ অবাক হয়ে দেখলেন যে টাটাদের পন্থনগর এবং পুনের কারখানা থেকে ন্যানোর প্রথম লটের গাড়িগুলিকে বার করার পরিকল্পনা করতে টাটাদের কোন অসুবিধাই হলো না। যদিও যেখানে অনুসারী শিল্প মূল কারখানার গায়ে আদৌ লেগে নেই। প্রশ্নটা যদি প্রযুক্তির হতো তাহলে তো এই পরিকল্পনাটাই করা যেত না!

পাশাপাশি এও দেখা গেল যে প্রধান বিরোধী পক্ষও কিন্তু ঠিক এই জায়গাটাতেই চূড়ান্ত আঘাত হানলেন। প্রকল্প এলাকার মধ্য থেকে প্রথমে চারশো এবং পরে তিনশো একর জমি ফেরৎ দিতে হবে— এই দাবিতে তারা অনড় রইলেন। ক্ষুব্ধ রতন টাটা আবার মন্তব্য করলেন যে বিরোধীদের পেছনে তার প্রতিযোগীদের উস্কানি আছে। এদিকে রাজভবন আলোচনায় প্রকল্প এলাকার মধ্য থেকে কেন তিনশো একর জমি ফেরৎ দেওয়া যাবে না এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পেরে প্রকল্প এলাকার মধ্য থেকে সর্বোচ্চ সম্ভব (ম্যাক্সিমাম পসিবল্) জমি ফেরৎ দেওয়া হবে এই মর্মে বিরোধীদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে অনুসারী শিল্পকে সাতদিনের জন্য কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। এবং এই সাতদিনের মধ্যে প্রকল্প এলাকা থেকে কোন কোন জমি ফেরৎ দেওয়া যেতে পারে তা দেখার জন্য সিঙ্গুরের বিচারকের নেতৃত্বে একটি চার সদস্যের কমিটিও গঠিত হলো। এইবার টাটাদের টনক নড়ল। পরিস্থিতি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তারা দ্রুতগতিতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রথমেই হাইকোর্ট থেকে তারা রাজ্যসরকারের সঙ্গে তাদের চুক্তির অপ্রচলিত অংশ প্রকাশের ওপর স্থগিতাদেশ নিয়ে আসলেন। একইসঙ্গে তারা অন্যান্য রাজ্যের প্রস্তাবগুলির দিকে এবার মন দিলেন। আতঙ্কিত বুদ্ধদেব মরিয়া হয়ে রাজভবন চুক্তির চারদিনের মাথায় সে চুক্তিকে কার্যত বাতিল করে কমিটি ভেঙ্গে দিলেন এবং অনিচ্ছুক কৃষকদের জন্য একতরফাভাবে একটি ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হলো না। রতন টাটা ততদিনে যা বোঝার বুঝে গেছেন। রাজ্যের জনগণ এবং সরকারের সম্পত্তিকে প্রবলভাবে দখল করে নিজের পুঁজিতে পরিণত করে ন্যানো প্রকল্পকে সার্থক করার এই বিরাট অর্থনৈতিক অপরাধকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের যে চূড়ান্ত রাজনৈতিক ঐক্যমত্য প্রয়োজন, যে কোন কারণেই হোক পশ্চিমবঙ্গে তা যে এখনও বিরাজ করে না এই বিশ্বাস তার ইতিমধ্যেই দৃঢ় হয়ে গেছিল।

রাজনৈতিক ঐক্যমত্য গুজরাট মডেল

চলে আসুন গুজরাটে। গুজরাটে আপনি স্বাগত! এখানে আমরা, মানে কি সরকার কি বিরোধী কেউই উন্নয়ন নিয়ে কোন রাজনীতি করি না। ধর্ম নিয়ে করি। আমরা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে আলাদা করে দিয়েছি, ঠিক যেমনটা আপনি চান। আমরা রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতাকে মিশিয়ে দিয়েছি, ঠিক যেমনটি আপনি চান। আপনার যা যা চাই— জমি, জল, বিদ্যুৎ, আর্থিক সাহায্য, দুহাত খুলে সরকারি সম্পত্তির অবাধ লুণ্ঠন— সব আপনি পাবেন। আপনার পদকমলে এই সবকিছুকে অতি দ্রুত উৎসর্গ করার ব্যাপারে এখানে আমরা সবাই অর্থাৎ সরকার, বিরোধী দারুণরকম ঐক্যবদ্ধ। যদিও ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে জনগণকে সাফল্যের সঙ্গে বিভক্ত রেখেছি। আর যদি এতদসত্ত্বেও কখনও সমাজের নিচুতলা থেকে সেইরকম বিরোধিতা আসে তাহলে আমরা তা কিভাবে দমন করতে হয় তা জানি। এ ব্যাপারে আমরা পাশবিক এবং নির্মম। যে দক্ষতায় আমরা সংখ্যালঘু গর্ভবতী মহিলার পেট চিরে তরোয়ালের ডগায় শিশুভ্রূণটিকে গেঁথে তুলেছিলাম, সেই একই দক্ষতায় এখন সরকারি এবং জনগণের সম্পত্তি লুণ্ঠনের গর্ভে আপনার সাধের ন্যানো প্রকল্প যাতে দিব্য বেড়ে ওঠে এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। আর সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করার ক্ষমতা ঐ বুদ্ধ ভট্টাচার্যের থেকেও আমাদের বেশি। লীলাবতী কমিশনের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। নির্দ্বিধায় চলে আসুন। গুজরাটে আপনি স্বাগত!

হ্যাঁ, এই হলো গুজরাট। রতন টাটার ন্যানো প্রকল্পের নতুন ঘর। নারী, শিশুসহ কয়েক হাজার সংখ্যালঘু মানুষের সুপরিকল্পিত অত্যাচারি সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য চরিত্র নরেন্দ্র মোদীর কোলেই যে সবশেষে সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত অনাথ রতন টাটা ঘর খুঁজে পেলেন তা হতে পারে ঘটনার এক অপূর্ব সমাপতন! কিন্তু গভীরতর বিচারে তা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় ইঙ্গিতবাহী।

আমাদের সমস্যা

লেখাটিকে এখানেই হয়ত শেষ করা যেত। কিন্তু পরিশেষে আরও কয়েকটি কথা না বলে নিলে টাটারা সিঙ্গুর থেকে চলে যাওয়ার পর যে ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হলো তা সম্যক বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু ফাঁক থেকে যাবে। সিঙ্গুর সংগ্রাম শুরু হয়েছিল কৃষিজমি টাটাদের হাতে তুলে দেব না— এই দাবিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ধীরে ধীরে লড়াইয়ের অভিমুখ বদলে যায়। প্রকল্প এলাকার মধ্যে থেকে যেন তেন প্রকারেন তিনশো একর জমি ছিনিয়ে নিয়ে আসার ওপরই লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র স্থাপিত হয়। একথা বলার মানে এই নয় যে লড়াইয়ের সামগ্রিক দাবিটিকে সদা সর্বদা অর্জন করা যেতেই হবে। অপেক্ষাকৃত কোন ছোট দাবি অর্জনের মধ্যে লড়াইটি শেষ হতে পারে না বা এমন হলেই নেতৃত্বকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। কিন্তু চলতে চলতে লড়াইয়ের অভিমুখ যদি বদলে যায়, লড়াইয়ের নীতিগত অবস্থান যদি বদলে যায় তাহলে নেতৃত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। সিঙ্গুর সংগ্রামের একটি বিশেষ পর্যায়ের পর থেকেই আমরা দেখেছি যে, 'আমরা শিল্পায়নও চাই আবার কৃষিজমি রক্ষা করতেও চাই' এই জাতীয় কথাবার্তা ক্রমশ জোরালো হয়েছে। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এমন কোন বক্তব্য সজোরে উপস্থিত করা হয়নি যা দিয়ে জনগণের কাছে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে তথাকথিত শিল্পায়ন, উন্নয়নের অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যের মতো সিঙ্গুর প্রকল্পটিও কোন সতিকারের শিল্পায়ন বা উন্নয়ন নয়। তা আসলে জনগণ এবং সরকারের (সরকারি সম্পত্তিও আসলে জনগণেরই সম্পত্তি) সম্পত্তি লুণ্ঠনের এক প্রবল পরিকল্পনা। সমাজের বুকে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই টাটাদের শুধুমাত্র সিঙ্গুর কেন, দেশছাড়া করবার কর্মসূচী বৈধতা পায়। নচেৎ টাটা হঠানো আন্দোলন জনমানসে বিভিন্ন প্রকার ধোঁয়াশা এবং সন্দেহই তৈরি করবে। আমাদের সমস্যা হলো আন্দোলনের নেতৃত্বের এই দুর্বলতা যা শেষ পর্যন্ত বিশ্বায়নী অর্থনীতিকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে একধরনের ঐক্যমত্যই গড়ে তোলে তার বিপরীতে সংগ্রামী বাম শক্তিগুলি তাদের ইতিহাস নির্দিষ্ট কাজটি অর্থাৎ বিশ্বায়িত পুঁজির সার্বিক বিরোধিতা করে উক্ত বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা— তা করে উঠতে পারল না। কোন স্বতন্ত্র বক্তব্য ছাড়াই লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে যে ধোঁয়াসা, প্রশ্ন সন্দেহগুলির উৎপত্তি হল তার দায়ভাগও তাদের ওপর বর্তাল। লড়াইয়ের ভবিষ্যত নেতৃত্ব গড়ে তোলার পদক্ষেপ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সিঙ্গুর থেকে টাটাদের পশ্চাদপসরণ আন্দোলনের একটি বিজয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আরও বৃহত্তর বিজয় অর্জনের জন্য আমাদের দুর্বলতা এবং সমস্যাগুলিকেও হিসাবের মধ্যে রাখা জরুরি।

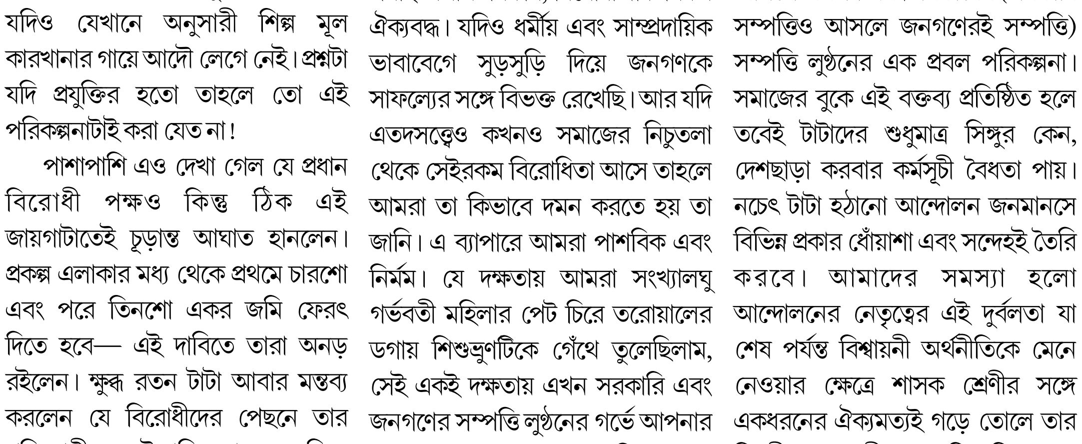

ধ্বংসের গহ্বরে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এ বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি ভারতের শেয়ার বাজার ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। শেয়ার সূচক বা সেনসেক্স ছিল ২১,০০০-এর ওপরে। বলা হচ্ছিল সেনসেক্স ৩০,০০০, ৪০,০০০, এমনকি ৫০,০০০-ও ছুঁতে পারে। সেই আশায় বহু সাধারণ লগ্নীকারীও শেয়ারে টাকা খাটিয়েছিলেন। বিশ্বমন্দার ধাক্কায় ঐ জানুয়ারি মাস থেকেই তা পড়তে শুরু করল। পতন হলো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। সেনসেক্স ১০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ উঠতে ৪৮৪টি লেনদেন পর্ব (ট্রেডিং সেশন) সময় নিয়েছিল। অথচ মাত্র ১৯১টি পর্বেই তা ২০,০০০ থেকে ১০,০০০-এর নীচে তলিয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত বড় লগ্নিকারীর সাথে সাথে অসংখ্য ছোট লগ্নিকারী সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। অনেকেই সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হলেন।

সাবপ্রাইম সংকটের ঢেউ প্রথমেই আমাদের দেশের যে শিল্পটিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা হলো তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প। ইউরোপ এবং আমেরিকার শিল্প এবং আর্থিক বাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এই শিল্পটি পৃথিবীর ঐ অঞ্চলে মন্দা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমস্ত কোম্পানীগুলি নতুন কাজের বরাত হারায়। বর্তমান কাজের আর্থিক মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। নগদ অর্থের যোগান হ্রাস হওয়ার ফলে বকেয়া টাকা হাতে পেতে দেরি হতে থাকে। টাটাদের টিসিএস কোম্পানী যেমন মূলত ইউরোপ এবং আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলির কাজই করত। সেখানে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যাঙ্কগুলি দেউলিয়া হতে শুরু করায় বিরাট ঝামেলায় পড়েছে টিসিএস। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সমস্ত কোম্পানী প্রকাশ্যে বা গোপনে, সরাসরি বা নানা ছলচাতুরী সহযোগে দেশজুড়ে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে চলেছে। মন্দা দেখা দেওয়ার ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে পণ্য এবং পরিষেবার চাহিদা কমছে। ফলত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য গভীর সংকটে পড়েছে। রপ্তানি শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু শ্রমিক ইতিমধ্যে কাজ হারিয়েছেন এবং আরও বহু শ্রমিক কাজ হারাতে চলেছেন। প্রচুর পরিমাণে সেজ এলাকা গঠন করে দেশে একটা রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার মনমোহনী প্রকল্প জোরালো প্রশ্নের সামনে পড়ছে। বিমান পরিষেবা শিল্পও বিরাট আর্থিক ক্ষতির মধ্যে আছে। তারাও হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এককথায় সাবপ্রাইম সংকট শুধুমাত্র ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃত অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি শাখাকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে। স্বাভাবিকভাবেই শিল্প উৎপাদন তলানিতে এসে ঠেকেছে। শিল্প উৎপাদনের সূচক ২০০৭ সালের আগস্টে যেখানে ছিল ১০.৯ শতাংশ সেখানে এ বছর আগস্টে তা দাঁড়িয়েছে ১.৩ শতাংশে। ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার গত বছরগুলির ৯ শতাংশ থেকে কমে এ বছর ৬.৯ শতাংশে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই আরও নীচের দিকে নামবে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সংকট আমাদের দেশের শুধুমাত্র মেহনতী সাধারণ মানুষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এমন নয়। দেশের সমস্ত অগ্রনী শিল্পপতিরও তা খাটিয়া খাড়া করে ছেড়েছে। এ বছরের ১১ জানুয়ারি এবং ১০ অক্টোবর এই নয় মাসে রতন টাটা তার মোট সম্পদের ৪৯.৫ শতাংশ হারিয়েছেন। কুমারমঙ্গলম বিড়লা হারিয়েছেন ৩৫.৫ শতাংশ, আজিম প্রেমজী ৪৫.৭ শতাংশ, মুকেশ আম্বানী ৪৭.২ শতাংশ, অনিল আম্বানী ৬৮.৮ শতাংশ, ও.পি জিন্দাল ৭০.৬ শতাংশ, কে পি সিং ৭৬.৫ শতাংশ, রমেশ চন্দা ৮৪.১ শতাংশ হারিয়েছেন (ইকনমিক টাইমস, ১৩ অক্টোবর, ২০০৮)। তালিকা রীতিমতো দীর্ঘ এবং ভারি। পুঁজিপতিরা তাদের এই সমবেত ক্ষতি এখন কীভাবে সাধারণ মানুষের কাঁধে চালান করা যায় সেটাকেই তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করে তুলেছেন। পুঁজিবাদে এটাই স্বাভাবিক। দশকের পর দশক ধরে এটাই ঘটছে এবং যতদিন পুঁজিবাদ টিকে থাকবে— এটাই ঘটবে!

সংকটের সমাধান— ওনাদের চোখে

অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন যে, এই সংকট তেমন একটা গভীর নয়। আমেরিকার নির্বাচনটা যদি জিততে পারেন ঠাণ্ডা মাথার ওবামা তাহলে তিনি বিশ্ববাসীকে এই সংকট থেকে বার করে আনতে পারবেন। নিজেদেরই অনুসৃত অর্থনীতির যাঁতাকলে যখন নিজেদেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে তখন ধনতন্ত্রের সমর্থক পণ্ডিতরা বোধহয় এরকমই ছেলে ভোলানো মাসি-পিসির গল্প শুরু করেন।

পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে সাবপ্রাইম সংকটের যে বর্ণনা আমরা এতক্ষণ দিয়েছি সেখান থেকে আদতে কী ঘটনা ঘটল তার যদি সারসংক্ষেপ করি তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকম যে, সমাজের গোটা সম্পদ বলে যা ধরা হয়েছিল তার অর্ধেকটা স্রেফ উবে গেছে এবং বাকী অর্ধেকটা দারুণভাবে অল্পকিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। ধরুন, আপনার হাতে তিনশো টাকা আছে। আর আমার হাতে তিনশো টাকা মূল্যের সোনা আছে। আপনাকে আর আমাকে নিয়েই যদি সমাজ হয় তাহলে সমাজের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ছশো টাকা। এখন, আপনি সোনার দাম বাড়বে ভেবে (বা অন্য কোন কারণে) আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা দিয়ে সোনাটা কিনে নিলেন এবং অল্পদিনেই বুঝতে পারলেন সোনাটা আসলে নকল যার প্রকৃত মূল্য কিছুই না। তাহলে, আপনার খাতা থেকে তিনশো টাকার সম্পদ মুছে দিতে হল। সমাজের মোট সম্পদের অর্ধেক উবে গেল এবং বাকিটা একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল। আপনি নিঃস্ব হলেন। সাবপ্রাইম সংকটের মতো ফাটকা পুঁজির সমস্ত সংকটই অনেক জটিল এবং বহুমাত্রিক রূপে অনেকটা এই ধরনের। একটা ঠাণ্ডা মাথা নয়, এই পরিস্থিতিতে আসলে দরকার বিরাট পরিমাণ গরম অর্থের। এখন প্রশ্ন হলো এই অর্থ আসবে কোথা থেকে?

অনেকেই বলছেন কেন, সরকার দেবে! সব কিছুকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, মিল্টন ফ্রিডম্যানের এই তত্ত্ব তো পুঁজিপতিরা ইতিমধ্যেই বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। আরও কার্যকরী তত্ত্ব এখন তাদের হাতে এসে গেছে। বাজার চলবে বাজারের মতো। যেখানে বা যখন বাজার অর্থনীতির জন্যই তৈরি হবে সংকট তখন রাষ্ট্র তার হাতে থাকা জনগণের সম্পদ দিয়ে তা মিটিয়ে দেবে। এই ধারার অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানকে নোবেল কমিটি এই বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে বিশ্বায়িত পুঁজির ক্যাপ্টেনরা এখন এই পথেই হাঁটতে চাইছে। চলতি সংকটকে মেটানোর জন্য আমেরিকার সরকার ৭০০ বিলিয়ন ডলার বাজারে ঢালার কথা ঘোষণা করেছে। বৃটেনের সরকার ঢালতে চলেছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার মতোই ইউরোপের বহু সরকারও তাদের দেউলিয়া হতে বসা ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিগ্রহণ করবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু জনগণের সম্পত্তি এইভাবে পুঁজিপতি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির তৈরি করা সংকটের মোকাবিলা করার জন্য ব্যয় করা যায় কিনা তা নিয়ে সারা পৃথিবীতেই অনেক বিতর্ক হচ্ছে। অনেক প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সব থেকে গুরুতর প্রশ্ন তো অন্য জায়গায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সাবপ্রাইম সংকটের উৎসস্থল আমেরিকার বন্ধকী বাজারের আয়তন ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এই ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদের ঠিক কতটা উবে গেছে যার বিনিময়ে ঋণপত্র কিনে বসে আছে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার কোন তল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১০০০ বিলিয়নে হয় এক ট্রিলিয়ন। ক্ষতির পরিমাণ যদি ১৪ ট্রিলিয়নের অর্ধেকও হয় তাহলেও তো সেই তুলনায় ৭০০ বিলিয়ন ডলার নস্যি মাত্র! এমনিতেই গত বেশ কয়েকবছর ধরেই আমেরিকার অর্থনীতিতে দুর্দিন চলছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার খুবই কম। এই মুহূর্তে আমেরিকার যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ রয়েছে তা তার ইতিহাসে কখনও হয়নি। চলতি খাতে ঘাটতিও গগনচুম্বী। বেকার সমস্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। এই রকম দুর্বল একটা অর্থনীতির পক্ষে এত বড় একটা সংকটকে আর্থিকভাবে মোকাবিলা করা কি আদৌ সম্ভব?

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিগ্রহণ করার প্রশ্নেও একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সরকারি অধিগ্রহণ করার পক্ষে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এতই বড় যে কুলকিনারা করা যাচ্ছে না। এ আই জি-র ৮০ শতাংশ শেয়ার কিনে এ আই জি-কে অধিগ্রহণ করতে গিয়েই আমেরিকার সরকারের দম বেরিয়ে গেছে। লেম্যানকে সাহায্য করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ইউরোপের বহু সংকটাপন্ন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত সম্পদ এমনকী তাদের দেশের মোট জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি। যেমন আইসল্যান্ডের সংকটাপন্ন ব্যাঙ্ক কাউপ্থিং-এর সম্পদ আইসল্যান্ডের জাতীয় আয়ের ৬২৩ শতাংশ পর্যন্ত ৬.২৩ গুণ বেশি। আইসল্যান্ডেরই ল্যান্ডসব্যাঙ্কির সম্পদ জাতীয় আয়ের ৩৭৪ শতাংশ। বেলজিয়ামের ফরটিসের সম্পদ বেলজিয়ামের মোট জাতীয় আয়ের ২৫৪ শতাংশ। ইংল্যান্ডের আরবিএস-এর সম্পদ ইংলন্ডের জাতীয় আয়ের ১২৬ শতাংশ। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। চারদিকেই এই অবস্থা। গত কয়েক দশকে লগ্নি পুঁজির বিরাট কেন্দ্রীভবন সংকট সমাধানের সমস্ত অর্থনীতিগত পথকেই অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। জনগণের অর্থ দিয়েই পুঁজিপতিদের সৃষ্ট সংকটের মোকাবিলা করতে চাইলেই এ মুহূর্তে তা করা যাবে কিনা— এটাই সর্বাপেক্ষা গভীর প্রশ্ন হিসাবে সামনে উঠে আসছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অবশ্য এইসব প্রশ্নে ঢোকেননি।

অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার বলেছেন যে এই সংকট মূলগতভাবে ধনতন্ত্রের বা বিশ্বায়নের সংকট নয়। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর এই গুণধর অধ্যাপকটি লিখেছেন 'আসলে জরুরী কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকলেই এই সংকট এড়ানো যেত' (আনন্দবাজার, ১৬ অক্টোবর, ২০০৮)। এবার আর ছেলে ভুলানো গল্প নয়। একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। অভিরূপবাবুর লেখা পড়লে মনে হবে আমেরিকাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ককে আলাদা করার ফলে এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং-এর উপর নজরদারির অভাবেই বোধহয় এই সংকট তৈরি হল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে ফারাক করা হয়েছিল অর্থনৈতিক ফাটকাবাজিকে নিয়ন্ত্রণের তাগিদেই। ১৯৩০-এর মহামন্দার ধাক্কায় যখন আমেরিকা এবং ইউরোপের অর্থনীতিগুলির কাহিল অবস্থা সেই সময়ে অর্থনীতিবিদ কেইন্স-এর হাত ধরে অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই তত্ত্বের প্রভাবেই ১৯৩৩ সালে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রবর্তিত হয়েছিল গস-গিল আইন। ফ্লোরিডার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইলস্ লিভিংস্টোন তার বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক 'মানি এন্ড ক্যাপিট্যাল মার্কেট' বইতে দেখিয়েছেন যে এই আইনের লক্ষ্য ছিল প্রধানত দুটি। এক, শেয়ার বাজারের ওঠাপড়ার ফলে যাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, যেখানে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় জমা থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং দুই, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে তাদের বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে শেয়ার বাজারের ওঠাপড়াকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। অর্থাৎ ফাটকার ক্ষেত্রকে সীমিত করে তোলার লক্ষ্যেই আমেরিকাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রকেও আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন জাদুতে নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বাধা টপকে এই দুই ধরনের ব্যাঙ্কিং ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে সেতু রচনা করল তার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা অভিরূপবাবুদের নেই।

অথবা ধরুন, এই যে অভিরূপবাবু বলেছেন— 'বর্তমান সংকটের কবল থেকেও আমরা রেহাই পেতে পারতাম। যদি আমাদের শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের ওপর কিছু কিছু বাধানিষেধ থাকত'— এটি সরাসরি আবারও একটি মিথ্যাভাষণ! নব্বই-এর দশকের শেষের দিকে ফাটকা পুঁজির খেলায় 'এশীয় বাঘেদের' পতন থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতে শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি বিদেশী বিনিয়োগের ওপর একগুচ্ছ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেছিল। গত বছর পার্টিসিপেটারী নোট বা পি এন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ-এর ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা ছিল এর অন্যতম। কিন্তু মূলগতভাবে পুঁজিবাদী কাঠামোকে মেনে নিয়ে লগ্নী পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সারা পৃথিবীতে কোথাও ধোপে টেকেনি। টিকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অভিরূপবাবুর লেখা থেকে মনে হতে পারে যে শেয়ার বাজারে ধ্বসটাই বোধহয় আদত সংকট। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মূল সংকট তা নয়, শেয়ার বাজারের ধ্বস মূল সংকটটির একটি অন্যতম প্রতিফলন মাত্র। প্রতিফলনকে নিরাময় করে মূল সংকটকে নিরনন করার চেষ্টা আসলে চোরকে না ধরে তার ছায়াকে জাপটে ধরার মতো ব্যাপার!

কোনদিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি?

এখনই এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া মুশকিল। কিন্তু ঘটনার গতির দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য— পুঁজি এবং সম্পদের বিরাট কেন্দ্রীভবন এবং অসম বিকাশই হলো এই সংকটের মূল কারণ। মজার ব্যাপার হলো এই ধরনের প্রতিটি সংকট আবার আরও তীব্র কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সামনে তুলে ধরে। এবং সেখান থেকে আরও বড় বিপর্যয়। এই হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুষ্টচক্র। এখানেও দেখা যাচ্ছে সেই একই ঘটনা।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সাবপ্রাইম সংকটকে মেটানোর মতো আর্থিক সম্পদ ইউরোপ-আমেরিকার সরকারগুলির হাতে নেই। তাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় এই সম্পদ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এই সম্পদের একটা তীব্রতম কেন্দ্রীভবন তাদের কাছে জরুরি। এর অর্থ হল গোটা বিশ্বের জনগণের ওপর বিশ্বায়িত পুঁজির আরও ব্যাপক হামলা, পৃথিবী জুড়ে আরও বড় ধরনের দারিদ্র্য, নিঃস্বীভবন, কর্মসংকোচন, ছোট মালিকদের সম্পত্তি হ্রাস ঘটতে থাকবে। এবং এই কেন্দ্রীভবন ঘটাতে হবে অতি দ্রুত। স্বাভাবিকভাবেই এই দ্রুত কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন না হলে অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশ্বায়িত পুঁজিকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যে ধরনের একটা ঐক্যমত্য বা মৈত্রীজোট গড়ে উঠেছে, লগ্নিপুঁজির বর্তমান সংকট তাকে ভালরকম আঘাত করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। মুদ্রাকে কেন্দ্র করে তার ভিত্তিভূমি রচিতও হচ্ছে। ডলার, ইউরো, ইয়েন এই ত্রিশক্তির লড়াই কতদিন লগ্নিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, বলা মুশকিল। পাশাপাশি আশার দিকও দেখা যাচ্ছে। ধীরে হলেও এই বিশ্বায়িত পুঁজির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে মেহনতী মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধের রাস্তায় নেমে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমান সংকট এই ঘটনাকে বড় ধরনের অভিঘাত দেবে। এককথায়, সাবপ্রাইম সংকট কোন ছোটখাট সংকট নয়। লগ্নিপুঁজির সংকটের তা বজ্রগর্ভ মেঘ। কিছু না কিছু উথাল-পাতাল তা ঘটাবেই।

আর্থিক মন্দার মধ্যে বিক্রী বেড়েছে মার্কসীয় সাহিত্যের

বিশেষ প্রতিবেদন : পুঁজিবাদী অর্থনীতির যখন জেরবার অবস্থা, ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে যে মার্কসীয় সাহিত্যের, বিশেষত মার্কসীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত পুস্তকগুলির বিক্রী বেড়ে গেছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। বিবিসির প্রকাশিত এক খবর অনুসারে, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জার্মানীতে একটি প্রকাশনা সংস্থা কার্ল ডায়েট্জ্-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাদের যেখানে বছরে গড়ে ২০০ কপি ডাস ক্যাপিটাল বিক্রী হত, সেখানে ইতিমধ্যে এবছর ১৫০০ কপি বই বিক্রী হয়ে গেছে। ঐ সংস্থার কর্ণধার জোয়ার্ন শুট্রাম্ফ-এর মতে, নতুন প্রজন্ম তাদের সমসাময়িক অর্থনৈতিক দিশায় খুশি নয়, তারা তাই সমাধান খুঁজছে মার্কসে। অন্যান্য প্রকাশনা সংস্থাও ডাস ক্যাপিটাল ছাপে এবং তাদের বিক্রীও বেড়েছে প্রায় ৩০০ শতাংশ।

Declaration No. 178/04; 18.11.04

ধ্বংসের গহ্বরে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি

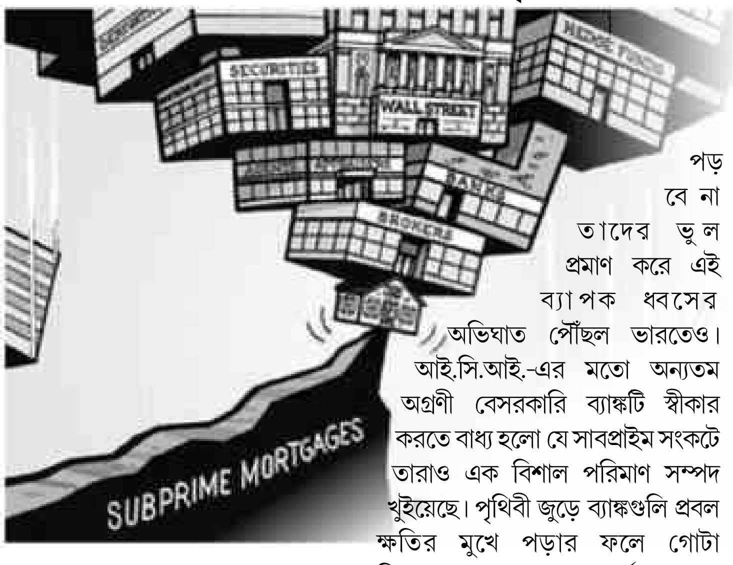

শিবপ্রসাদ মিত্র

দুনিয়া জুড়ে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিরাট ধ্বস নেমেছে। আমেরিকার লগ্নি পুঁজির বাজারে এযাবৎকালের বৃহত্তম সংকট যা সাবপ্রাইম সংকট নামে পরিচিত তা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকদিন ধরে প্রচণ্ড চেষ্টা চালানো হয়েছিল এই সংকটকে লুকিয়ে রাখতে। বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি লাইনও চোখে পড়ছিল না। বিশ্বায়নী অর্থনীতির ক্যাপ্টেনরাও এই প্রশ্নে কঠোর মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন। পুঁজিবাদী শিবিরের লোকজন বরাবরই যা করেন— তাদের সমস্ত নোংরা সুদৃশ্য কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলেন— এ ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে তারা সেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু গত ১৬ সেপ্টেম্বর যখন ১৫৯ বছরের পুরনো ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্স-এর দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার খবর উল্কার গতিতে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল তখন বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির শরীরে দুরারোগ্য মারণ রোগের পচা ঘাগুলো জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে গেল। একের পর এক পতনের খবরের ঢেউ বয়ে গেল। বিশ্বের বৃহত্তম বিমা কোম্পানী এ.আই.জি. (আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ) নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টা আগে আমেরিকার সরকার কোম্পানীটিকে অধিগ্রহণ করে নিল। ফেনি রে এবং ফ্রেডি ম্যাক, এই দুটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ককে মার্কিন সরকার আগেই অধিগ্রহণ করেছিল। এবার এই তালিকায় এ.আই.জি-র নামও যুক্ত হলো এবং এই তালিকা ক্রমশঃই লম্বা হওয়ার আশংকা তৈরি হলো। আমেরিকার বিখ্যাত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বীয়ার স্টার্ন নামমাত্র মূল্যে আগেই বিক্রি হয়ে গেছিল। এবার সেই খাতায় নাম লেখালো আমেরিকান পুঁজিবাদের স্তম্ভস্বরূপ মেরিল লিঞ্চ কোম্পানী। বিক্রি হয়ে গেল আমেরিকার ষষ্ঠ বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ওয়াচোভিয়া। গতকাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে যে নামগুলি সম্ভ্রমে উচ্চারিত হত, অবিশ্বাস্য গতিতে সেই নামগুলি আর্থিক লেনদেনের পাতা থেকে মুছে যেতে শুরু করে দিল।

একই অবস্থা ইউরোপেও। ইংলণ্ডের নর্দান রক ব্যাঙ্ক সাবপ্রাইম সংকটের ধাক্কায় গতবছরই বিক্রি হয়ে গেছিল। এবার ইউরোপ জুড়ে এই সংকটে বিপদাপন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি অধিগ্রহণের ধুম পড়ে গেল। বেলজিয়ামের ফরটিস, আইসল্যান্ডের ল্যান্ডসব্যাঙ্কিকের মতো কিছু ভারী নামও এই তালিকা থেকে বাদ গেল না। বর্তমানে ইংলণ্ডে প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি সংস্থা বা ব্যাঙ্ক নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে। একই অবস্থা জাপানেও। সেখানেও ব্যাঙ্ক এবং লগ্নি পুঁজির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে একই সংকটের করাল ছায়া। যারা বলেছিলেন ভারতের মতো দ্রুত উত্থিত বাজারগুলিতে এই সংকটের কোন প্রভাব পড়বে না তাদের ভুল প্রমাণ করে এই ব্যাপক ধবসের অভিঘাত পৌঁছল ভারতেও। আই.সি.আই.-এর মতো অন্যতম অগ্রণী বেসরকারি ব্যাঙ্কটি স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সাবপ্রাইম সংকটে তারাও এক বিশাল পরিমাণ সম্পদ খুইয়েছে। পৃথিবী জুড়ে ব্যাঙ্কগুলি প্রবল ক্ষতির মুখে পড়ার ফলে গোটা বিশ্ববাজার জুড়ে নগদ অর্থের চলাচল প্রচণ্ডভাবে কমে আসল। এর ধাক্কায় আবার শিল্প উৎপাদনও প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। পণ্য ও পরিষেবার চাহিদাও কমতে শুরু কল। লগ্নিপুঁজির সংকট শুধুমাত্র লগ্নি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না, তা পণ্য এবং পরিষেবার উৎপাদন এবং বন্টনের প্রকৃত অর্থনীতির ওপরও আঘাত হানতে শুরু করল। পৃথিবী জুড়ে একের পর এক সংস্থায় কর্মী ছাঁটাইয়ের বন্যা বয়ে যেতে শুরু করেছে। এক কথায় গোটা পৃথিবী জুড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত। মানুষ দিশাহারা এবং আতঙ্কিত। প্রতিদিন পরিস্থিতি নতুন করে খারাপ হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে না এই ধ্বসের শেষ কোথায়। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায়ই বা কি। কিন্তু কেন এই সংকট? আসুন দেখা যাক।

সংকটের শুরু—আমেরিকার বন্ধকী বাজার

আমেরিকার সমাজ একটি মূলত ভোগবাদী সমাজ। সেখানকার অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো নাগরিকদের সমবেত ভোগের পরিমাণ। স্বাভাবিকভাবেই সেই অর্থনীতির কারিগররা সেই ভোগের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভোগ করতে গেলে তো হাতে পয়সা থাকা দরকার। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদের বিপুল অধিকাংশই তো উপরের অল্প কিছু লোকের হাতেই জমা হয়। তাহলে উপায়? উপায় একটাই। ঢালাও ঋণদান। ঋণ দেয় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের বাজার মোটা দাগে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো প্রধান বাজার বা প্রাইম মার্কেট আর অন্যটি হলো অপ্রধান বাজার বা সাবপ্রাইম মার্কেট। প্রাইম মার্কেটে ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয় তার সুদের হারকে বলা হয় চলতি সুদের হার (প্রাইম লেন্ডিং রেট)। সমাজের অবস্থাপন্ন লোকেদের নিয়ে তৈরি হয় প্রাইম মার্কেট। পুঁজিবাদের জমানায় (এমনকি আমেরিকাতেও) স্বাভাবিকভাবেই এই লোকেদের সংখ্যা হাতে গোনা, বাজারের আয়তন ছোট। আর অর্থনৈতিকভাবে সমাজের দুর্বল লোকেদের নিয়ে গঠিত হয় সাবপ্রাইম মার্কেট। এই লোকেদের সংখ্যা সুবিপুল। বাজারের আয়তন অনেক বড়। সুতরাং আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলো এই বাজারে কিভাবে ঢোকা যায় এবং ঋণ ব্যবসা বাড়ানো যায় তার চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। যেহেতু এই বাজার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাই ব্যাঙ্কগুলো এই বাজারে যে ঋণ দিতে শুরু করে তার সুদের হার চলতি সুদের হারের থেকে কমিয়ে দেয়। এই কম সুদের হার সাবপ্রাইম লেন্ডিং রেট নামে পরিচিত। এখন যেহেতু এই বাজার আর্থিকভাবে দুর্বল তাই এই বাজারে ব্যবসা করা অনেক বেশি ঝুঁকির কাজ। তাই ব্যাঙ্কগুলো এই বাজারে ঋণ দেওয়ার জন্য বন্ধকী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ধীরে ধীরে আমেরিকার বন্ধকী বাজার ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে এই বাজারের আয়তন ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার যা ভারতের মোট জাতীয় আয় বা জিডিপি-র (১.১ ট্রিলিয়ন ডলার) প্রায় ১৪ গুণ। আমেরিকার বন্ধকী বাজারে বন্ধকের কাজে প্রধানত ব্যবহৃত হতে শুরু করে ঘরবাড়ি। ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে সহজেই ঋণ পাওয়ার ফলে ঘরবাড়ির চাহিদা বাড়তে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘরবাড়ির দামও বাড়তে থাকে। পাশাপাশি লগ্নী পুঁজির ফাটকা খেলার প্রবণতার দরুণ এই দাম তার প্রকৃত দামের থেকে অনেক বেশি ফাঁপিয়ে দেখানো হতে শুরু করে। ২০০১ সাল থেকে আমেরিকার নির্মাণ শিল্পে তৈরি হতে থাকে ফাটকার বুদবুদ।

এদিকে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে আমেরিকা ও ইউরোপে যে মহামন্দা ঘটে তার ধাক্কায় ১৯৩৩ সালে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। ঐ বছর সেখানে পাশ হয়েছিল গস স্টিল আইন। ঐ আইনের সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং-কে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আমেরিকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দেয় তা পরিশোধের সময়কাল অবধি বসে না থেকে তা বিক্রি করে দেয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলি আবার এই একই ঋণপত্রগুলিকে সারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করে। যেহেতু এই ঋণগুলির ওপর মোটা অংকের বীমা করানো থাকে তাই সেগুলিকে গ্রহণ করতে কেউই দ্বিধা করে না।

কিন্তু বুদবুদ তৈরি হলে তা ফাটবেই। বস্তুতপক্ষে, একবার বুদবুদ তৈরি হওয়া এবং তার ফেটে যাওয়া এবং আবার বুদবুদ তৈরি হওয়া এই চক্র বর্তমান ফাটকা পুঁজি নির্ভর সাম্রাজ্যবাদী তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলেছে। এবং বুদবুদের প্রতিটি ফেটে যাওয়া যে সংকট তৈরি করছে তা সর্বদাই আগেকার সংকটের থেকে গভীরতর এবং বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে। এবারও তাই হলো। ২০০৬ সালের প্রথম থেকে আমেরিকার গৃহনির্মাণ শিল্প একটা স্থবিরতায় পৌঁছতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়তে শুরু করল। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়লে জিনিসের দাম যায় কমে। ঘরবাড়ির দাম কমতে শুরু করল এবং এই নিম্নগতি যখন একেবারে মাটিতে পৌঁছে শেষ হল তখন দেখা গেল যে ঘরবাড়ি বন্ধক রেখে যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ঘরবাড়ির দাম তার থেকেও নিচে নেমে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই ঘরবাড়ি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক যে ঋণ দিয়েছিল তা আদায় করা অসম্ভব হতে শুরু করল। আতঙ্কিত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলো বন্ধকী ঘরবাড়ি দ্রুতগতিতে বিক্রি করার চেষ্টা করার ফলে ঘরবাড়ির দাম আরও পড়তে শুরু করল। শুরু হয়ে গেল 'সাবপ্রাইম সংকট'। কোটি কোটি ডলারের ঋণপত্র, যা সারা পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়েছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি একে অন্যকে বিক্রি করেছে তা বাজে কাগজে পরিণত হল। আমেরিকার বন্ধকী বাজারকে কেন্দ্র করে এমন এক ভূমিকম্প শুরু হল যা বিশ্ব অর্থনীতির পায়ের তলার মাটিকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিল।

সংকটের গভীরতা— নগদ অর্থের যোগান হ্রাস

ঋণপত্রগুলি বাজে কাগজে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দেখল যে তাদের মোট সম্পদ তাদের খাতায় যা লেখা আছে আসলে তা নয়। তার থেকে অনেক কম। কারণ বছরের পর বছর ধরে পয়সা দিয়ে তারা কিছু বাজে কাগজ কিনেছে। সুতরাং একবার ধরা পড়ে যাওয়ার পর এই বিশাল পরিমাণ সম্পদ খাতা থেকে মুছে দিতে হল। অর্থনীতির পরিভাষায় এর নাম হলো রাইটঅফ্। গত বছরের শেষের দিকে এই মুছে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ মোটামুটিভাবে হিসাব করা হয়েছিল চারশো বিলিয়ন ডলার। এ বছর মার্চ মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ছশো বিলিয়ন ডলার। এরপর থেকে এই সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেছে। বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক তাদের ক্ষতির পরিমাণ সাধ্যমতো গোপন করার চেষ্টা চালিয়েছিল, শেয়ার বাজারে তাদের দর কমে যাবে ভেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গোপন রাখা যাচ্ছে না। লাফিয়ে লাফিয়ে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। আমেরিকার ১৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বিপুল বন্ধকী বাজারের ঠিক কতটা উবে গেছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিমা কোম্পানীগুলি এই উবে যাওয়া সম্পদের ঠিকা নিয়ে বসেছিল। এই বিরাট ক্ষতি মেটাতে না পেরে লাল বাতি জ্বালতে হয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে দ্রুতগতিতে এই বিপুল সম্পদ আসলে ভুয়ো প্রমাণিত হওয়ার ফলে, উবে যাওয়া বা মুছে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ বিরাটভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে, স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কগুলি দেখল যে তাদের হাতে যে পরিমাণ নগদ অর্থ আছে বলে তারা মনে করেছিল আসলে তা নেই! পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, হেজ ফাণ্ড, বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, বিনিয়োগকারী— লগ্নিপুঁজির এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে সৃষ্টি হলো প্রচণ্ড অবিশ্বাস এবং সন্দেহ। লগ্নিপুঁজির গোটা জগৎটা চলে একজনের পয়সা বা সম্পদ অন্যজনকে ধার দিয়ে, বিক্রি করে বা বিনিয়োগ করে। কিন্তু 'সাবপ্রাইম সংকটে' কে কতটা ফেঁসে রয়েছে, আজকে যাকে টাকা ধার দিচ্ছি সে কালকে সকালেই দেউলিয়া হয়ে যাবে কি না— এই সমস্ত প্রশ্নে ধোঁয়াশা এবং গোপনীয়তা থাকার ফলে এই অবিশ্বাস আর সন্দেহ লাগামছাড়া হয়ে উঠল। ফলত, কেউই আর হাতে পড়ে থাকা পয়সা অন্যকে ধার দিতে চাইছে না। মূলত, এই দুটি কারণে দুনিয়াজুড়ে তৈরি হল নগদ অর্থের যোগান হ্রাস— লগ্নি পুঁজির গভীর সংকট যার পোষাকি নাম লিকুইডিটি ক্রাঞ্চ।

ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলি একে অন্যকে যে সুদের হারে টাকা ধার দেয় তা লণ্ডনের ব্যাঙ্কের সুদের হার দিয়ে ঠিক হয়। সুদের এই হারের নাম হলো লণ্ডন ইন্টারব্যাঙ্কিং অফার্ড রেট, বা সংক্ষেপে, লিবর। গত একমাসে লিবর তার স্বাভাবিক হারের তুলনায় প্রায় ১০০০ বেসিস পয়েন্ট ওপরে উঠে গেছে। ভারতের ব্যাঙ্কগুলি পরস্পরকে টাকা ধার দেয় মুম্বাইয়ের ব্যাঙ্কের সুদের হার মেনে। এর পোষাকি নাম হলো মুম্বাই ইন্টারব্যাঙ্কিং অফারড্ রেট, বা সংক্ষেপে মিবর। মিবরও তার স্বাভাবিক হারের তুলনায় ১৮০০ বেসিস পয়েন্ট ওপরে উঠে গেল। সারা পৃথিবীর সমস্ত শেয়ার বাজারগুলি থেকে বড় ছোট সমস্ত ধরনের বিনিয়োগকারী কোটি কোটি ডলারের বিপুল বিনিয়োগ উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে। পৃথিবীর ৫২টি শেয়ার বাজারই এর ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আমেরিকার শেয়ার সূচক ডাও জোন্স এ বছরের ৮ জানুয়ারি ছিল ১২,৫৮৯ পয়েন্টে আর ১৭ অক্টোবর এসে দাঁড়াল ৮,৯৭৯ পয়েন্টে। ভারতের শেয়ার সূচক সেনসেক্স ৮ জানুয়ারি ছিল ২১,০৭৮ পয়েন্টে আর ১৭ অক্টোবর এসে দাঁড়াল ৯,৯৭৫ পয়েন্টে। ইউরোপ এবং এশিয়ার সমস্ত প্রধান শেয়ার বাজারেই একই হাঁড়ির হাল। স্বাভাবিকভাবেই সারা পৃথিবীতে প্রচুর মানুষ সর্বস্বান্ত হল এবং হয়ে চলেছে। সমান তালে শুরু হয়েছে আত্মহত্যা। এক দিশাহারা এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি! পৃথিবীর বহু দেশেই পেনসন ফাণ্ড বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডগুলি সরকারের হাতে থাকে না। এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের মতন বিভিন্ন বেসরকারি বিনিয়োগকারী। আমাদের দেশেও এই অপচেষ্টাটিকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। পৃথিবী জোড়া এই শেয়ার বাজার বিপর্যয়ে হেজ ফাণ্ড, মিউচুয়াল ফাণ্ডেকর মতন শেয়ার বাজারের সঙ্গে জোড়া এই পেনশন ফাণ্ড এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডগুলিও বিরাট লোকসান করেছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক বড় অংশই চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ। এদের এক বিরাট অংশ চোখের সামনে দেখতে বাধ্য হচ্ছে তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়, তাদের শেষ পারানের কড়ি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপর্যয়ে কেমন করে গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে!

লগ্নি পুঁজির সংকট শুধুমাত্র লগ্নিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, থাকতে পারেও না। পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন এবং বন্টনের প্রকৃত অর্থনীতিতে তা তার করাল ছায়া বিস্তার করে এবং করছেও। নগদ অর্থের যোগান কমে যাওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রে শুরু হয়েছে বিরাট সংকট। নতুন শিল্পস্থাপন দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি তাদের সমস্ত ধরনের সম্প্রসারণ প্রকল্প বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। নগদ অর্থ হাতে না থাকার কারণে কর্মীদের মাইনে দেওয়া যাচ্ছে না। সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে মাইনে কমানো হচ্ছে। সারা পৃথিবীজুড়ে চলছে ব্যাপক ছাঁটাই। শুধুমাত্র হিউলিট প্যাকার্ডের মতন কোম্পানীই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা তাদের অফিসগুলিতে মোট ২৬,০০০ কর্মী ছাঁটাই করবে বলে ঘোষণা করেছে। এ রকম ঘোষণা যে সবাই করছে এমন নয়। লুকিয়ে চুরিয়ে নানা চাতুরির সাহায্যে যে যেখানে যেমন পারছে কর্মী ছাঁটাই করে চলেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারীত্ব বাড়ছে। বিশ্ব রণক্ষেত্রে বিশ্বশ্রমের ওপর রাহুগ্রস্থ বিশ্বায়িত পুঁজি তার মরিয়া হামলাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে চলেছে। অদৃষ্টপূর্ব মাত্রায় রক্তাক্ত হচ্ছে বিশ্বায়িত পুঁজি এবং বিশ্বশ্রমের দ্বন্দ্ব।

সাবপ্রাইম সংকট এবং ভারতবর্ষ

গত এক বছর ধরে বিশ্বায়িত পুঁজির সমর্থক অর্থনীতিবিদ্‌রা আমাদের বোঝাচ্ছিলেন যে, সাবপ্রাইম সংকটের ধাক্কা ভারত বা চীনের মতো দ্রুত উত্থিত দেশগুলিতে লাগবে না। এমনকি তারা এই আশাও প্রকাশ করেছিলেন যে ভারত, চীনের মতো দ্রুতবৃদ্ধির অর্থনীতিগুলি কক্ষচ্যুত বিশ্ব অর্থনীতিকে পাল্টা ধাক্কা দিয়ে পুনরায় তাকে তার ঈপ্সিত কক্ষে ফেরত পাঠাতে সক্ষম। আমাদের দেশের সরকার এবং নীতি নির্ধারকরা প্রবলভাবে এই কথাই বোঝাচ্ছিলেন যে আমাদের অর্থনীতি নিরাপদ। বিশ্ববাজারের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত (কাপ্‌লিং) হয়েছি বটে। কিন্তু যখনই বিশ্ব অর্থনীতি বিপদে পড়বে তখনই আমরা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন (ডিকাপ্‌লিং) হতে পারব। আবার যখন বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা কেটে গিয়ে তেজী ভাব ফেরৎ আসবে তখন আমরা পুনরায় সংযুক্ত (রিকাপ্‌লিং) হব। কিন্তু হায়! বিধি বোধহয় সর্বদাই বাম! গত দিনগুলির অভিজ্ঞতা এই সমস্ত তত্ত্ব, আশ্বাস, বাগাড়ম্বরকে ধুলোয় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। সাবপ্রাইম সংকট থেকে সৃষ্টি হওয়া সামগ্রিক বিশ্ব সংকট অপ্রতিহত গতিতে ধাক্কা দিয়েছে ভারতবর্ষকে।

শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়

সত্ত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক : অমৃত পৈড়া**